বিবিধ প্রবন্ধ

পু.

প্রথম ভাগ।

"ধনবিজ্ঞান" "বাণিজ্য" ও ১৯১২ সালের ইণ্টারমিডিয়েটের পাঠ্য
পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত "বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ"
প্রণেতা
শ্রীগিরীন্দ্র কুমার সেন এম, এ, প্রণীত।

২৪৮১

সরকার এণ্ড কোং।
৫৪-৮ কলেজ ষ্ট্রীট।

"লোকনাথ যন্ত্র"
১১।১ নবাব্দি ওস্তাগরের লেন হইতে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক
আর, এল, সরকার
৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৮৪৩
(ক)

বক্তব্য বিষয়।

বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর বালকেরা যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞাতব্য বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে সমর্থ হয়েন সে কারণে বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ঐ পুস্তকে নৈতিক, সামাজিক, পৌরাণিক নিত্য প্রয়োজনীয়, এবং বালকদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয় সংক্ষেপে কিরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে এবং অপ্রাসঙ্গিক কথাও যাহাতে বক্তব্য বিষয়ে সন্নিবিষ্ট না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

অনেক সময় বালকেরা কোন্ বিষয়ে কি লিখিবে ভাবিয়াই আকুল হয়। পর্য্যবেক্ষণ, মনোমধ্যে আন্দোলন, অধ্যয়ন এবং নিজ গণ্ডির মধ্যে প্রাত্যহিক দ্রষ্টব্য ঘটনা, স্বদেশবাসীর আচার ব্যবহার সামাজিক পদ্ধতি, অপর দেশের শ্রুত কথা—ইত্যাদির প্রতি অবহেলাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই অবহেলার ফলে কর্ম্মজীবনে পদে পদে অজ্ঞতার ফল ভোগ করিতে হয়।

এই পুস্তক পাঠে যদি বালকদিগের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি,

গবর্ণমেণ্ট কমার্শ্যাল ক্লাসেস্
১১ই মাঘ ১৩১৬ সাল।

শ্রীগিরীন্দ্র কুমার সেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৬১

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি	
ভ্রাতৃবৎসলতা	৪
জীবজন্তুর প্রতি কর্ত্তব্য	৬
ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার	৮
অতিথি সেবা	১০
স্বাস্থ্যরক্ষা	১১
ছাত্রজীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য	১৭
আকাঙ্ক্ষা	২১
সংসর্গ	২৩
শিষ্টতা	২৬
স্বাবলম্বন	২৯
সময়ের ব্যবহার	৩৪
পরোপকার	৩৮
প্রত্যুপকার	৪১
ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা	৪৩
সত্যানুরাগ	৪৬
অধ্যবসায়	৪৮
একাগ্রতা ও অভিনিবেশ	৫২
স্বদেশভক্তি	৫৭
সাধুতাই প্রশস্ত উপায়	৬১
বিনয় ও সৌজন্য	৬৬
রাজভক্তি ও রাজস্ব প্রদানের সার্থকতা	৭০

বিষয়।	পৃষ্ঠা
পরিশ্রম ও মিতব্যয়ই ধনাগমের একমাত্র উপায়	৭৫
যাহাই কেন ঘটুক না কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে	৭৭
দীর্ঘসূত্রতা	৮৫
আলস্য	৮৯
অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণা	৯৪
স্বার্থপরতা	৯৯
বাণিজ্য	১০৩
কৃষি ও শিল্প	১০৯
গৃহপালিত পশু	১১৫
বঙ্গদেশের ঋতু সকল	১২২
একটী নদী (গঙ্গা)	১৩১
রেলপথ	১৩৫
পোষ্ট বিভাগের আবশ্যকতা	১৩৮
মুদ্রাযন্ত্র	১৪১
কয়লা	১৪৩
ভূমিকম্প	১৪৭
হরিশ্চন্দ্র	১৫০
ধ্রুব	১৫৪
একলব্য	১৫৭
নলদময়ন্তী	১৬০
সীতাচরিত্র	১৬৬
আয়েষাচরিত্র	১৭০
বড় লোকের জীবনের উপকারিতা	১৭৩
কলিকাতাদর্শন	১৭৫

2৪৮৯

বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি।

যখন বয়স হইলে চিন্তা করি যে, কাহার কৃপায় এ সংসার আমার হইল, কাহার কৃপায় আজ এত বড় হইলাম, কাহার কৃপায় মধ্যে মধ্যে সঙ্কট—ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছি, তখন স্বতঃই মাতা পিতার কথা মনে হয়। বড় হইয়া আরও মনে হয়, যখন আমরা পায়ে হাঁটিতে ও কথা কহিতে শিখি নাই, যখন ক্রন্দন ভিন্ন আমাদের অভাব জানাইবার উপায় ছিল না, তখন মাতা পিতাই আমাদের অভাব পূরণ করিয়াছেন। মাতা দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিজ সুখ বা দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আমার মঙ্গলের নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু এই সকলই কি মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির একমাত্র কারণ? আমরা কয়জন এই সকল কারণ বিচার করিয়া ভক্তি করিতে শিক্ষা করিয়াছি? এ সকল কথা ত আমরা বড় হইয়া ভাবিতে ও বলিতে শিখিয়াছি। তবে কি এ সকল কথা শিখিবার পূর্ব্বে আমরা মাতাপিতাকে ভক্তি করি নাই? কখনই নহে। আমি তাঁহাদের পুত্র বলিয়াই মাতাপিতা আমার দুঃখে, আমার সুখে, আমার আব্‌দারে, আমারই মত ভাবিয়াছেন এবং তাঁহারা আমার মাতা পিতা বলিয়াই আমি তাঁহাদের ভালবাসার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অবিচারিত চিত্তে তাঁহাদের প্রতি অন্তরের সহিত মুগ্ধ হইয়াছি। এই জন্যই আমার মাতার সহিত অপরের মাতার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় না। কত আত্মীয়

স্বজনের যত কৃপা, কত গুণাবলীতে কত না মুগ্ধ হইয়াছি, কৈ তাঁহাদের কৃপা ও গুণের কথা মাতাপিতার প্রতি ভক্তি বিষয়ের কখন তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মনে হয় তাঁহাদের মূর্ত্তির মধ্যে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় ভাব নিহিত আছে, যাহা দেখিলে, যাহা ভাবিলে আত্মহারা হইতে হয় ও সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম নিবেদন করিয়া সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। এই আত্মনিবেদনের মূলে ভক্তি নিহিত। এই ভক্তির মূলে অনুরাগ এবং অনুরাগের মূলে অভিন্ন ভাব—এই ভাব আমরা মনে মনে বুঝিতে পারি, কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার বলিয়াই আমি তাঁহাদের ভক্তি করি এবং আমি তাঁহাদের বলিয়াই "অসিতবরণ" হইলেও তাঁহাদের নিকট "কষিত কাঞ্চন"। এই নিমিত্তই ভীষণ দুঃখে পতিত হইলে অথবা রোগশয্যায় অধীর হইলে মাতা পিতাকে সম্মুখে না পাইলেও 'মা' "মা" "বাবাগো" বলিয়াই শান্তি ও সন্তৃপ্তির শীতল বারিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এই নিমিত্তই প্রবাসে থাকিয়া তাঁহাদের মূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এই নিমিত্তই তাঁহাদের নিকট আসিয়া একেবারে তাঁহাদের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছি ও তখনই তাঁহাদের করস্পর্শ সুখে সন্তৃপ্ত হইয়াছি। এই নিমিত্তই দারুণ রোগশয্যায় যখনই বলিয়াছি "মা তুমি এখনও খাও নাই", মা বলিয়াছেন "একটু ভাল হও বাবা, খাওয়াত আছেই, একেবারে পূজা দিয়া খাইব।" অহো, এ কথা জগতে আর কে বলিতে পারে ?

যাঁহাদের চিন্তা কেবল আমারই জন্য, ধ্যান কেবল আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত, ধারণা উপাসনা আমারই হিতকামনায় সঞ্জাত, যাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই অযাচিত ভাবে কত না দুর্লভ সামগ্রী লাভ করিয়াছি, ও যাঁহারা দিন নাই রাত্র নাই অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশায়

প্রণোদিত না হইয়া আমারই মঙ্গল-কামনায় কাতর কণ্ঠে ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে দেবতার নিকট অবিরত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। তথাপি তাঁহাদের উপর অভিমান করিয়াছি, রাগ করিয়াছি ও তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের কি অদ্ভুত ক্ষমা গুণ! জগতে অপর কে কাহাকে এরূপ ক্ষমা করিতে পারেন? কে মনে মনে আশ্বস্ত হইতে পারেন যে বড় হইলে ছেলের ঐ দোষ কখনই থাকিবে না। এই সকল গুণের বিষয় চিন্তা করিয়াই সংসারে স্বর্গসুখ অনুভব করা যায়। পণ্ডিতেরা তদ্গতচিত্ত হইয়া বোধ হয় এই নিমিত্তই বলিয়াছেন জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ এবং পিতাই পরম তপস্যা।

এই যে ভক্তি ও স্নেহের কথা বিবৃত হইল তাহা কেবল মানব জীবনেই সম্ভবপর, কারণ উৎকৃষ্ট সুস্বাদু দুর্লভ ফল পাইলে মাতাপিতা সন্তানকে না দিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন না, কিন্তু ইতর জন্তুদের মধ্যে মাতাপুত্রে বা পিতাপুত্রে অনেক সময় কলহ হইয়া থাকে।

কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমরা বড় হইয়া লাভ করি, কারণ যাহা করা উচিত তাহাই কর্ত্তব্য এবং কোন কার্য্য করা উচিত, বা না করা উচিত, তাহা বিশেষ জ্ঞান না হইলে বিচার করা যায় না। এই জ্ঞান লাভ করিয়া, মাতা পিতা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিলেও তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রীতি বিধান করা মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া, রামচন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষ এই সকল ব্রত উদ্যাপিত করিয়া স্ব স্ব জীবন সার্থক করিয়াছেন।

ভ্রাতৃবৎসলতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহ আপনা হইতেই আমাদের মনে জাগরূক হয়। এই ভক্তি ও স্নেহের মূলেও অনুরাগ ও হৃদয়ের অভিন্নতা। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ যেন মাতা পিতারূপ এক বৃক্ষের শাখা মাত্র, কোনটী বড় ও কোনটী ছোট। প্রবল বাত্যায় তাহারা সকলেই চঞ্চল হয় এবং মধু যামিনীর মৃদু মধুর মন্দ হিল্লোলে সকলেই মর্ম্মর পুলকে পুলকিত হয়।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে পরস্পরের মধ্যে বাল্যকালে মাতা পিতার উপর যে পক্ষপাতিত্ব দোষারোপের মন্দ ইচ্ছা উদ্দীপিত হইয়া থাকে, তাহা অপনোদিত হইয়া পরস্পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য পালনের পরাকাষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা দেখিলে ও শ্রবণ করিলে, এ ধরাধাম স্বর্গধাম বলিয়া অনুমিত হয়।

দূতশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থের সহিত যুবরাজ ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া যখন শুনিলেন, যে কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় ও সত্য ধর্ম্মের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে নিজের রাজ্যাভিষেক হইবে, এবং যখন অবগত হইলেন, যে রাজোচিত পরিধেয় বিনিময়ে শ্রীরামচন্দ্র জটাবল্কল পরিধান করিয়া রাক্ষস-সেবিত ঘোর দণ্ডকারণ্যে বাস করিবেন, এবং ধর্ম্মবীর রাম সেই অশুভ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিমাতার ও অন্যান্য মাতৃগণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়াছেন, এবং তদনন্তর পিতৃদেব শোকে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন ভ্রাতৃবৎসল ভরত জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। ক্রমে যুবরাজ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পিতৃদেহ সংকার করিবার পর যে ভ্রাতৃবৎসলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জগতে অতি দুর্লভ।

রাজসভার উপদেষ্টা কাশ্যপ, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বশিষ্ঠের সহিত উপস্থিত হইয়া যখন ভরতকে পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন যুবরাজ জিতেন্দ্রিয় শ্রীরামচন্দ্রের স্নেহ ও তাঁহার প্রতি ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিয়াছিলেন, "যাহা জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য এবং যাহা ধীমান্ ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্রের যোগ্য তাহা ভোগ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করাও পাপ, এবং বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ভক্তি ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দস্যুর মত তাহা ভোগ করা ও পরস্বাপহরণ করা সমান কথা। এ রাজ্যের রাজা শ্রীরামচন্দ্র এবং আমি তাঁহার প্রজা মাত্র।"

আমরা বলিয়াছি ভক্তি ও স্নেহ কথায় প্রকাশিত হয় না। ইহা হৃদয়ের যে নিভৃত স্থান হইতে উদ্গত হয় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই কারণ ভরত মাতৃগণ, গুরু পুরোহিত, অমাত্য, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি লইয়া শ্রীরাম-দর্শনাভিলাষে বহির্গত হইলেন। পথে কত লোকে কত কথাই ভাবিল। রামসখা গুহক এমন কি ভরদ্বাজ এবং লক্ষ্মণও সন্দেহ করিলেন বুঝিবা নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে ভরত বৈমাত্রেয় শ্রীরামচন্দ্রের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত। অহো! এ মনের কথা শ্রীরামচন্দ্র ও ভরত ব্যতীত কে বুঝিবে। এই কারণে শ্রীরামচন্দ্র অবিচারিতচিত্তে ভরতকে দেখা দিলেন এবং ভরত তাহার শ্রীচরণে আত্ম নিবেদন করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—কিন্তু ইহাই শেষ নহে। পরস্পর পরস্পরকে রাজ্যভোগের নিমিত্ত কত না অনুরোধ করিলেন এবং কত না যুক্তি দেখাইলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের সম্মুখে কিছুই স্থিতি লাভ করিল না—স্নেহের প্রাবল্যে শ্রীরামচন্দ্র পরাস্ত হইলেন। তিনি রাজা বলিয়া পরিগণিত হইতে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না এবং প্রজা ভরতের ভক্তির জয় হইল। তিনি প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব

ভক্তি। যদি রাজধানীতে রাজকার্য্য সমাধা করিতে করিতে আত্মম্ভরিতা উপস্থিত হইয়া ভাতৃভক্তি হ্রাসমাণ হয়, এই ভাবিয়া স্বার্থ-বিজয়ী জিতেন্দ্রিয় ভরত পুর প্রবেশ না করিয়া মন্ত্রিগণ সহ পাদুকা যুগল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং যতদিন না রামচন্দ্র প্রত্যাগত হয়েন পাদুকার নামে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

জীবজন্তুর প্রতি কর্ত্তব্য।

মঙ্গলবিধাতা জগৎপতি কর্ত্তৃক যত জীবই সৃষ্ট হইয়াছে, উহারা সকলেই পরস্পরের উপকার-সাধনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এমন কি ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র জন্তুর চর্ম্মেও যোগী ঋষির আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ জগতের আদিম নিবাসীরা যখন খাদ্যহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিত, তখন হইতে জীব জন্তুরা আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে জীবজন্তুই আমাদের প্রধান মূলধন ছিল। এই ধন সামগ্রীর সাহায্যেই আমরা অন্যধন উৎপাদন বা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া আজি সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। গো মহিষ প্রত্যহ দুগ্ধ দিয়া প্রথম হইতে আমাদের প্রাত্যহিক আহারের চিন্তা কতক পরিমাণে নিরাকৃত করিয়াছে। মেষ ও ছাগ ঊর্ণাদ্বারা প্রথমেই আমাদের লজ্জা নিবারণ করিয়াছে এবং ষণ্ড অশ্বের মত সমস্ত দ্রব্যভার বহন করিয়া একদেশ হইতে অন্যদেশে লইয়া গিয়া ও শ্রমসাধ্য নানাবিধ কর্ম্মের শ্রম সংক্ষেপ বিষয়ের সহায়তা করিয়াছে এবং স্বার্থপর মানবজাতি স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত এতাবৎ উহাদিগকে যত্ন করিয়া আসিয়াছে।

এই জীবজন্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি এমন নয়নমনোহর এবং এক এক সময়ে ইহারা এরূপ করুণ নয়নে দৃক্পাত করে, যে তাহাদের

দেখিলে স্বতঃই মনে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং বিশ্ব বিধাতার অদ্ভুত সৃজন মাহাত্ম্যের বিষয় অনন্যমনে অনুধাবন করিতে ইচ্ছা হয়। হরিণগুলি যখন একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে মনে হয় যেন আঁখিতে কত কথাই বলিতেছে। গাভীগুলি বৎসের হাম্বারবে যখন ঘন ঘন এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন বাৎসল্য ভাবের স্বরূপতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং কুকুরগুলি যখন প্রভুকে দেখিবামাত্র চঞ্চল পুচ্ছে নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকে, তখন জগতে মনুষ্য যে কেন অকৃতজ্ঞ হয় তাহা চিন্তা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

এই কৃতজ্ঞ, এই উপকারী, এই মনোমোহকর, এই বাৎসল্যপূর্ণ জীবের যে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। শাসিত সভ্য দেশে অপেক্ষাকৃত ধীমান, বীর্য্যবান, রূপবান বা ধনবান কোন প্রকারে মূর্খ বা দুর্ব্বল বা কুৎসিত বা দরিদ্রকে লাঞ্ছিত করিতে পারে না, অথবা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। যদি করে, তাহা হইলে লাঞ্ছিতের উহা প্রকাশ অথবা অনুযোগ করিবার অধিকার আছে, এবং ঐরূপ করিলে হয় সমাজ না হয় রাজশাসন আসিয়া অপকারীর দণ্ড বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইবে। কিন্তু পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে তাহার পক্ষে কে অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিবে? অধিকন্তু মানবের প্রতি অত্যাচার করিলে অনেক সময় ক্ষতি পূরণ করিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যায় এবং অনেক সময় ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অপকৃতের সন্তোষ সাধন করা যায়, কিন্তু পশুর পক্ষে কোন যুক্তিই প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহাকে অর্থ দিয়া বা কাপড় দিয়া তাহার ক্ষতি পূরণ করা যায় না এবং পশুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অথবা অপরাধ স্বীকার করিলে অনুতপ্ত হৃদয়ের যাতনা সে অনুভব করিতে পারে না। এ সকল কারণ জ্ঞাত

হইয়া যে মানব পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি মানব নামের কখনই যোগ্য নহে।

পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারও যেরূপ অন্যায় তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও সেরূপ কর্ত্তব্য। যে জীবের দ্বারা আমরা জগতে প্রায় সমস্ত বাস্তব সামগ্রী লাভ করিতে সহায়তা পাইয়াছি, তাহার প্রতি আমরা যতই কৃপাবান হইব, তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা যতই দৃষ্টি রাখিব, ততই তাহাদের মঙ্গলের সহিত আমাদেরও মঙ্গল সাধিত হইবে এবং আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার।

মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে কর্ত্তব্য তাহা বর্ণভেদে বা দেহের বলভেদে বা অবস্থার বিপর্য্যয় ভেদে কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমার শ্বেতচর্ম্ম বলিয়া যে আমি কৃষ্ণচর্ম্মের লোককে লাঞ্ছিত করিব, আমার বল অধিক বলিয়া যে আমি দুর্ব্বলকে পীড়ন করিব, এবং আমার ধন অধিক বলিয়া যে আমি দরিদ্রকে কষ্ট দিব, ইহা সভ্যজগতে একপ্রকার অসম্ভব। জগতে অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বর্ত্তমান থাকায় কেহ বা প্রভু এবং কেহ বা ভৃত্য হইয়া থাকে। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু তাহার শ্রমের বিনিময়ে প্রভুর নিকট বেতন পাইয়া থাকে এবং প্রভুও তাহাকে দান হিসাবে না দিয়া কর্ম্ম করাইয়া তদ্বিনিময়ে তাহাকে অর্থ দিয়া থাকেন।

প্রভুও ভৃত্যে যখন এই সম্বন্ধ বিরাজমান, তখন ভৃত্যের যেরূপ কর্ম্মে অবহেলা করিবার অধিকার নাই প্রভুরও সেইরূপ ভৃত্যের প্রতি ভৃত্য বলিয়া দুর্ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। অধিকন্তু আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভৃত্যেরা উচ্চশ্রেণীদের চিরমুখাপেক্ষী এবং কখন মনেরও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে নাই। প্রভু ও ভৃত্য কখনই

মৌলিক ভাবে স্বতন্ত্রতা চিন্তা করে না। ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াই প্রভুকে ও প্রভুপত্নীকে পিতামাতারূপে এবং প্রভুপুত্রদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে সম্বোধন করে। যদিও সভ্য সমাজে মানব মাত্রেরই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্বন্ধে আইন আদালত সৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি আমার দেশের ভৃত্য, প্রভুর বিপক্ষে কখন ঐ সকলের সাহায্য লইতে অগ্রসর হয় না। তাহাদের আদালত প্রভুপত্নীর বিপক্ষে প্রভু এবং প্রভুর বিপক্ষে প্রভুপত্নী।

যে দেশে প্রভু ও ভৃত্যে এরূপ সম্বন্ধ সে দেশে ভৃত্যের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রায়ই বিরাজিত থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক প্রভু ও প্রভু পুত্রেরা সে সকল কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন, ভৃত্য ও পশুতে যেন কোন প্রভেদ নাই। হায়, জগৎপিতা তাহাকে অবস্থাহীন অথবা বুদ্ধিহীন করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবার কোন শাস্ত্র রচিত হইয়াছে? সে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন ধনহীন মানব বলিয়াই কি করুণা বা অনুকম্পার পাত্র হইতে পারে না? যদি প্রভুর সমান গুণ না থাকে তথাপি অন্যান্য মানবের লাঞ্ছিত না হইবার অধিকার হইতেই বা সে কোন্ কারণে বঞ্চিত?

এ জগতে মন দিয়াই মন পাওয়া যায়। রোষ প্রকাশ বা ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে কখনই আশ্রিত মানবের মন পাওয়া যায় না এবং ঐ হেতু মন্-মরা লোকের দ্বারা মন দিয়া প্রাণ দিয়া কর্ম্ম পাওয়া কখনও সম্ভবপর হয় নাই। কর্ম্মের খাতিরেই আমরা ভৃত্য নিয়োগ করিয়া থাকি এবং যদি কর্ম্ম-প্রাপ্তিতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রভুকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মান অপমান, প্রহার বেদনা, পীড়া কষ্ট, সুখ দুঃখ বোধ, যখন সকল মানবেই বর্ত্তমান, তখন ভৃত্যের নিকট কর্ম্ম-প্রাপ্তি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কিংবা সুবুদ্ধির পরিচায়ক। যদি ভৃত্যের কোন আত্মীয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাহার মনঃকষ্ট হয়, অথবা

কোন পীড়া বশতঃ যদি তাহার শারীরিক কষ্ট বা দৌর্ব্বল্য থাকে, তাহা হইলে নিজে সেই অবস্থায় পতিত হইলে কিরূপ মনের বা শরীরের ভাব হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ব্যবহার করা উচিত। ভৃত্যের প্রতি কটু ও অশ্রাব্য কথা প্রয়োগ করিলে কেবল যে তাহাকে মনঃকষ্ট দেওয়া হয় এরূপ নহে, পার্শ্বস্থ আত্মীয় স্বজনকে লজ্জায় অধোমুখ করা হয়, অভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আপনার স্বভাবকে কলঙ্কিত করিতে হয়, অধিকন্তু, অন্তরে ভদ্র প্রবৃত্তি নিহিত থাকিলে, ক্ষণপরে লজ্জায় ও ক্ষোভে অভিভূত হইতে হয়।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে ভৃত্য ঐ কারণে কার্য্যে অবহেলা করিবে এবং তাহার পীড়ায় সেবা করিলে অথবা তৎপ্রতিকারার্থ স্ব ইচ্ছায় চেষ্টা করিলে আপনাকে বুঝি ছোট করিতে হয়। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ ভুল। ভৃত্যের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে নিজের পীড়া বা অন্য সঙ্কট সময়ে তাহার দ্বারা যেরূপ কার্য্য পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় আত্মীয়ের নিকটও প্রত্যাশা করা যায় না।

অতিথি-সেবা।

যুবকদিগের অনেকের মধ্যে—বিশেষতঃ কলিকাতার অধিবাসী যুবকদের মধ্যে ধারণা যে যদি কোন ব্যক্তি, তিনি পরিচিত হউন বা অপরিচিত হউন, বিনা নিমন্ত্রণে বাটী আসিয়া উপস্থিত হয়েন ও এক বেলা অবস্থান করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি বোধ হয় অন্নসংস্থানহীন। নচেৎ আসিবেন কেন? কিন্তু কার্য্য গতিকে বা কোন রূপ বিপদে পড়িয়া বা রেল ফেল হইয়া, যদি কোন অল্পপরিচিত, পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি বাটীতে আসেন, তাহা হইলেও কি বুঝিতে হইবে তিনি অন্নসংস্থান

হীন? যদি বা অপহৃত হইয়া বা অজ্ঞতা বশতঃ তিনি যে অন্ন রাহা খরচ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যদি ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি তিনি অন্নসংস্থানহীন? বাস্তবিক মনোমধ্যে এই সকল কথার আলোচনা না করিয়াই অনেকে আকার ইঙ্গিত ক্রমে নিকটস্থ সরাই বা হোটেল অথবা শুনিলে কষ্ট হয় সদাব্রতের কথাও বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। সূর্য্যদেব মস্তকোপরি আরোহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন এরূপ সময়ে স্নান ভোজন করেন নাই, এরূপ কোন ভদ্র বংশজাত অতিথি, যদি দ্বারে আসিয়া আপনার অবস্থানের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে সত্বর যত্নবান হইয়া সেই অতিথির কষ্ট অপনোদন করায় যে কেবল পুণ্য সঞ্চয় করা হয় এরূপ নহে, আপনার হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশের অবকাশ পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে। পিতা হয়ত কর্ম্মস্থানে বহির্গত হইয়াছেন, কখন ফিরিবেন ঠিক নাই, এস্থলে পিতার প্রত্যাবর্ত্তন অপেক্ষা না করিয়া, অথবা তিনি আসিলে যেরূপ বিধান করিবেন সেইরূপ করা যাইবে, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অতিথিকে অনাদর করা বা তাহার সুখ বিধানে অযত্ন প্রকাশ করা, কুশিক্ষার ফল বুঝিতে হইবে। ভাল তোমার পিতার যদি অমতই হয়, তোমার সংসারে তোমার নিজের যে খাদ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে দান করিতেত কেহ তোমাকে বাধা দিবে না। পরের কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যদি নিজের কিছু ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি কি বোধ করিতেই হইবে? এরূপ অনেক অতিথি আছেন যাহারা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, অথবা কেবল রাত্রে শয়ন করিয়া, আপনার জনের সন্ধান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি মিষ্টান্ন বা একগ্লাস জল বা দুইটী পান বা এক ছিলিম তামাকেই পরিতৃপ্ত। এরূপ স্থলে খরচ না করিয়া তাহার নিমিত্ত একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাবনাযুক্ত হইলে, অথবা সহানুভূতি দেখাইলে এবং কোন স্থানে বা আত্মীয়ের নিকট

তাহাকে পৌছাইয়া দিলে, যদি তাহার সুবিধা হয়, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপ করিলে, অবশ্য নিজের কোন সাক্ষাৎ উপকার নাও হইতে পারে, তথাপি অন্যের উপকার করিয়া মনুষ্য-জীবন সার্থক করা যাইতে পারে।

হইতে পারে আজি কালি ভিক্ষা অনেকের ব্যবসার মধ্যে এবং অনেক তস্কর, অতিথির ভাণ করিয়া, চৌর্য্য কার্য্যসুকর করিয়া লয়, কিন্তু এ কথাও সত্য যে ভদ্রলোক নিতান্ত বিপদে না পড়িলে অন্য গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েন না। এরূপ স্থলে অবশ্য সাবধানতা বিধেয় বটে, কিন্তু অতি সাবধান হইয়া, যিনি বিপদে পড়িয়া হঠাৎ গৃহে আসিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেওয়া, কোমল হৃদয়কে কঠিন করিবার প্রয়াস পাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আরব দেশীয় মুসলমানদিগের অতিথি-সেবার কথা শুনিলে অনেক সময় গল্প কথা বলিয়া মনে হয়। পরম শত্রুও অতিথি হইলে, ইহাদিগের পূজনীয়। অভ্যাগত কেহ সম্মুখে থাকিলে তাহাকে না দিয়া ইহারা কখন পান ভোজন করে না। হিন্দু শাস্ত্রে অজ্ঞাত ব্যক্তি সময়ে বা অসময়ে বাটীতে আসিলে তাহাকে অতিথি বলা যায়, এবং অতিথি সেবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বচন হইতে বোধগম্য হইবে যে অতিথি সর্ব্বময় দেবতা যে হেতু তিনি নীচবর্ণের হইলেও পূজনীয়।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ
পূজনীয়ো যথা যোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥"

শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য।

ইতি পূর্ব্বে অন্যের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আলোচিত হইয়াছে। এখন শিক্ষার্থীর নিজের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য তাহা

পরে পরে আলোচিত হইতেছে। শিক্ষার্থীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিরাখা।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

যাহার দেহ সবল ও সুস্থ, সে যথারীতি পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন ও অভ্যাস করিতে পারে। প্রবৃত্তি ও অধ্যবসায় থাকিলে শ্রমসাধ্য কার্য্যে বিরক্তি উপস্থিত হয় না এবং অভ্যাসের সহিত তাহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইলে কোন কার্য্য আরম্ভ বা শেষ করিতে প্রবৃত্তিই জন্মে না এবং প্রবৃত্তি না থাকিলে মনোযোগ ও অধ্যবসায় হয় না। দেহের অবসন্নতার সহিত মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয় এবং ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকে না।

অবস্থার দাস না হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিতে এবং বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ শরীরের প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন লয়েন, তাহা হইলে জন সমাজের যাতনাভার যে কি পরিমাণে লাঘব হয়, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেরাই বলিয়া থাকেন যে পরিমিত শারীরিক যত্ন লওয়া স্বার্থপরতা মাত্র। কিন্তু অসুস্থ হইলে পরিজনগণ এবং বর্ত্তমান ও ভাবী প্রতিপাল্যদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে, এ বিষয়ে দৃক্পাত না করিয়া, আমোদের অন্বেষণে বা উন্নতির ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, যাহারা জীবনকে ব্যাধিসঙ্কুল করিতে প্রবৃত্ত হন, বোধ হয় তাহাদের তুল্য স্বার্থপর লোক জগতে বিরল।

স্বাস্থ্য মনুষ্যের সম্পদ বিশেষ হইলেও ইহা অন্য ধনের মত নহে। ইহার ভোগে সুখ কিন্তু ইহা দান করিবার নহে, ক্রয় করিবার নহে বিক্রয়ও করিবার নহে। ধনবান অর্থপ্রদান করিয়া যে সামগ্রী ক্রয়

করেন, উহা ক্রীত হইলে অধিকারী হইতে বিচ্যুত হয়, কিন্তু এ ধন সেরূপ ক্রয় করা যায় না। বেতন দিলে বলীয়ানের বলের বা পরিশ্রমের ব্যবহার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু রুগ্ন ধনী উহা ক্রয় করিয়া নিজে বলবান হইতে পারেন না।

আমাদের স্বাস্থ্য ও মনের নিকট সম্বন্ধ। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যে চলাফেরার বা দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যাদি অসম্পন্ন থাকে, এরূপ নহে, গৃহে থাকিয়াও মানসিক কার্য্যের ব্যাঘাত হয় এবং নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্ম চিন্তা করাও অসম্ভব হয় (শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং)। একথা আজ নূতন বলিয়া কাহারও বোধ হইবে না সত্য, কিন্তু কয়জন শরীরের প্রতি যথাযথ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন? যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেরই বিশ্বাস যে উহা একটী পরম ভোগ্য বস্তু এবং অষ্টপ্রহরীয় পোষাকের প্রতি যেরূপ যত্ন থাকে নিজ শরীর রক্ষার্থে সেরূপ যত্নও তাঁহারা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা হয়ত অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করিয়া, গায়ের শালখানিকে, প্রতিদিন ব্যবহারের পর পাট করিয়া রাখেন, এবং ধূলি বর্জ্জিত করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য যেন অমনি পাইয়াছেন, যেন বড়ই সহজলভ্য, অতএব যত্নের আবশ্যকতা নাই এরূপ বিবেচনা করেন। বাস্তবিক দাঁত থাকিতে যেরূপ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না, স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হইলে, স্বাস্থ্যের মর্য্যাদাও সেইরূপ উপলব্ধি করা যায় না। স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হইলে আর বুঝিতে পারা যায় না, যে যিনি স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত তিনি অন্য সুখেও বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য লাভের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হইবে যে পূর্ব্ব হইতে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া, উন্নতি লাভের অন্যতম উপায় এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার পর তৎপ্রতি যত্ন প্রদর্শন করা দূরদর্শীর কর্ম্ম নহে। স্বাস্থ্য থাকিতে যিনি উহার মর্য্যাদা বুঝেন না, তাঁহার

শিক্ষার্থীর মত কতকগুলি নিয়ম পালন করা উচিত। তাঁহার অবগত হওয়া উচিত যে তাঁহার স্বাস্থ্য উত্তম বলিয়াই তিনি পান ভোজনে পরিতোষ লাভ করেন, নচেৎ আহার নিদ্রাদি স্বভাবের কার্য্য সমাধানে তাঁহাকে কৃতদাসের মত কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—তাঁহার স্বাস্থ্য উত্তম বলিয়াই যে কোন শয্যা তাঁহার আরামপ্রদ, নিদ্রা তাঁহার ক্লেশহারিণী, হেমাম্বুদ-কিরীটিনী ঊষা তাঁহার সঞ্জীবনী সুধা, পদব্রজে সুদূর ভ্রমণ তাঁহার স্বাধীনতা সুখ ভোগ, এবং ব্যায়াম তাঁহার আনন্দদায়িনী ক্রীড়া। স্মরণ শক্তি চির সহচর করিতে, রসিকতা ও প্রথম যৌবনলালিত্য অধিককাল স্থায়ী রাখিতে, ব্যাধি মন্দির ব্যাধি বিতাড়িত করিতে, স্বাস্থ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্। স্বাস্থ্য হইতেই আত্মা তাহার কারাগারে সুখী হয় এবং উহার অক্ষিরূপ গবাক্ষে আসিয়া স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যই আমোদে আমোদ প্রদান করে এবং হর্ষে হর্ষানুভব করায়।

স্বাস্থ্য যখন সহচর হইতে অনিচ্ছুক হয়, অথবা যখন একেবারেই পরিত্যাগ করে, তখন সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ লাভ করা সাধনা-সাধ্য কাম্য বস্তুর অন্তর্গত হয়। স্বাস্থ্যের অভাবে, যে নিদ্রা সন্ধ্যার পর শরীরের ক্লান্তি হরণ করিতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত অনুগতের মত সেবা করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, আজ সে স্বেচ্ছাচারিণী—দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা আজ বিশ্রাম দানে অক্ষম—সুরসাল পক্ব ফল আজ আস্বাদহীন দৃশ্যমনোহর সামগ্রী মাত্র, এবং বন্ধুর আশ্বাসবাণী, করুণাময়ী মাতার স্নেহকরস্পর্শ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য, শরতের শশী, ঝটিকান্তে নিস্তব্ধতা, নিদাঘের বারিপাত, এ সমস্ত যেন অনুভব সুখের নহে, কেবল কথার কথা বলিয়া মনে হয়। যে চক্ষুর বিমল জ্যোতিঃ কত লোকের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, যে চাহনির মনোমোহকর শক্তি কত স্তিমিত হৃদয়ে নবীন ভাবের স্রোত আনিয়াছিল, যে কটাক্ষের ঘৃণা ও

রোষ কত দুর্ব্বিনীতকে শিষ্ট করিয়াছিল, আজ সে নয়ন, সে চাহনি সে কটাক্ষ দীনকাতর ও দীপ্তিহীন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ মানবের পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিলে কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় ঃ—

“ফুলগুলি তার গিয়াছে ঝরিয়া রয়েছে ডোর”

স্বাস্থ্যহীন মানবের দ্বারা যখন জগতে উপকার সাধন সুদূরপরাহত, যখন সমাজের অকল্যাণ ও গৃহজীবনে অশান্তি অবশ্যম্ভাবী, তখন স্বাস্থ্য থাকিতে উহা অক্ষুণ্ন রাখা সম্বন্ধে দেশকাল ও পাত্রভেদে যে নিয়ম প্রতিপাল্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মগুলি সাধারণের পক্ষে প্রতিপালন করা সহজসাধ্য। দুগ্ধপোষ্য বালকও অক্ষুধায় ভক্ষণ করে না, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত লোভী ক্ষুধা না থাকিলেও রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী দেখিলে লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। ভোজন করা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে ক্ষুধাই আমাদের একমাত্র নিদান-কর্ত্তা। প্রাণ ধারণের জন্য অনিশ্চিত আহার অন্বেষণ করিতে অঙ্গচালনা করিতে হয় বলিয়া অন্যান্য জীব জন্তুতে পরিপাক শক্তির শৈথিল্য লক্ষিত হয় না। মানব জাতি কিন্তু সঞ্চিত আহার দেখিয়া অঙ্গ চালনাকে কৃত্রিম উপায়ে শরীর রক্ষা করা বলিয়া অনুমান করে। তাহার স্থিতিশীল হওয়া স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। আদিম মানব জাতি অন্যান্য জীব জন্তুর মত জনতাপূর্ণ গ্রামে বহু ব্যক্তির সহিত এক গৃহে বাস করিত না। অতএব অন্যান্য স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান প্রয়োজন বিধায়ক হইলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা কখনই অনুকূল হইতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে উহা শরীর ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বন্য জন্তুরাও কলুষিত জল পান না করিয়া নির্দ্দিষ্ট নির্ঝরিণীর ও স্রোতস্বিনীর বিশুদ্ধ জল পান করে। জল কেবল নির্ম্মল হইলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ

হয় না, উহাতে অন্যান্য দোষও থাকিতে পারে। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন গ্রামে ব্যাধির আধিক্য হইলে, তথাকার জল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে এবং আবশ্যক হইলে স্থান ত্যাগ করিবে। চতুষ্পদেরা জলে গিয়া গাত্র ঝাড়া দিয়া মলহীন হয়, অতএব আমাদেরও দুই হস্তের সাহায্য পাইয়া গাত্র ও পরিধেয় পরিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। নিদ্রা সম্বন্ধেও স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপাল্য। নিদ্রার সময় নিদ্রা না যাইলে স্বভাবের বিরুদ্ধে আচরণ করা হয় এবং যে সময় জগতের অন্যান্য সমস্ত জীব ঊষার আলোকে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনের জোর পাইয়া সমস্ত দিনের কর্ম্ম সমাধা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, সে সময়ে অকারণে শয্যাপ্রিয় হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

ছাত্র-জীবনে সাধারণ কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের জীবন যে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে ছাত্রজীবন অন্যতম। বাল্যকাল হইতে উক্ত জীবন আবদ্ধ হয়। এ জীবনের মত সুখের জীবন আর দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ আমাদিগের জ্ঞান হওয়ার পরই আমাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান হয় না এবং আমাদিগের কি করা উচিত বা অনুচিত, এ সম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিবার লোকের অভাব হয় না। প্রথমতঃ আমাদিগের মাতাপিতা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিরেখা অঙ্কপাত করিবার মানসে আমাদিগকে স্বতঃই ক্রমিক উন্নত ও মানব মধ্যে পরিগণিত দেখিয়া কৃতার্থ হইবার আশায় নিঃস্বার্থভাবে যে সকল উপদেশপ্রদান করিয়া থাকেন, তাহার ত কথাই নাই, অধিকন্তু যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উভয়ের শিক্ষাগুণে আমরা অন্য চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া আত্মোন্নতির দিকে যে ভাবে প্রধাবিত হই, তাহা কেবল ছাত্র জীবনেই সম্ভবপর। এই সময়ে তাঁহাদের মনো

ভূমি সদ্যোমথিত নবনীতবৎ অতিশয় কোমল থাকে বলিয়া বিদ্যোপার্জ্জন, জ্ঞান-সঞ্চয়, মানসিক উন্নতি-সাধন ও চরিত্র-গঠন ইত্যাদি সহজ সাধ্য হয়। আবার এই সময়েই আলস্যপরবশ হইয়া এবং কুসংসর্গে ও কুমন্ত্রণায় অনেক বালক বিপরীত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

ছাত্র শব্দের অন্য একটী নাম শিষ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরুর শাসন-বাক্য মস্তকে ধরিয়া তাঁহার উপদেশ বিদ্যালয়ে ও গৃহে একমাত্র সম্বল করিয়া স্থির ধীর ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকে সেই শিষ্য, সেই ছাত্র নামের যোগ্য। ছাত্র কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গুরুর দোষ আচ্ছাদন করা। পূর্ব্বের ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাস করিত এবং অহোরাত্র বাস করায় গুরুর অধ্যাপনা ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার বা প্রকৃতি দেখিতে পাইত; বোধ হয় গুরু সম্বন্ধে যাহাতে অন্য কথার আলোচনা না হয়, সেই জন্য ছাত্র কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে অথবা গুরুগৃহে যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণ শিক্ষকের আদেশ ব্যতীত কোন প্রকার ক্রীড়া বা পাঠে আবিষ্টচিত্ত হইয়া অন্য কোন বিষয় চিন্তা করা অতিশয় দূষণীয়। বিদ্যামন্দিরে মনে করা উচিত, যে কেবল শিক্ষকের আদেশ ও তাঁহার অনুজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আগমন করা হইয়াছে এবং আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা; তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্যই শিক্ষকের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করা। কোন বিষয়ে একাগ্র হওয়ার শক্তি বিদ্যালয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

জগৎপিতা জগদীশ্বর আমাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞান অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, কেবল আহার বিহার প্রভৃতি কার্য্যে সময়াতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অবস্থায় কালকবলে আত্ম সমর্পণ করিতে কিন্তু প্রেরণ করেন নাই। জগতে আমাদের যে সকল

কর্ত্তব্য বিহিত রহিয়াছে, কেবল আত্মীয় পরিজনের জন্য নহে,—যাহা সমাজের নিমিত্ত সকলের নিমিত্ত, তাহা কর্ত্তব্য মত সাধন করিতে কেবল যে জ্ঞানার্জ্জন-একান্ত কর্ত্তব্য এরূপ নহে, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতাও নিতান্ত আবশ্যক। অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কখন জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া রত্ন লাভ করা যায় না। এই রত্ন লাভ করিতে বিদ্যালয় আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা জানি উদ্ধত স্বভাব, আত্মাভিমান, অবাধ্যতা, সময়ে কার্য্য না করা, এই সকলের পরিপন্থী। গৃহেই হউক আর বিদ্যামন্দিরেই হউক, আর সৎগ্রন্থ-পাঠেই হউক, কোন আদর্শ বা উদাহরণ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে হইবে। বিদ্যামন্দির অপেক্ষা গৃহেই আমাদের অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, অতএব সেই সময় যদি বৃথা চলিয়া যায়, তাহা হইলে গুরুদত্ত শিক্ষা যেরূপ বিফল হয়, সেইরূপ নূতন শিক্ষাও বোধগম্য করিবার শক্তি হ্রাস পায়। গৃহে পিতা মাতা ও তাঁহাদিগ হইতে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ যাঁহারা আমাদিগকে এ জগতে আসিতে দেখিয়া নিতান্ত কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট শিখিবার ও জানিবার এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাবে প্রাণপণে তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিণী, সহপাঠী ও আশ্রিত দিগকে যে সর্ব্বদা স্নেহপূর্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, একথাই বা কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে।

শিক্ষকের প্রতি পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং আত্মীয়ের ন্যায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করা নিতান্ত উচিত। যে ছাত্র তাহার শিক্ষককে নিজগুণে যত অধিক আকৃষ্ট করিতে পারে, সে ছাত্রের শিক্ষারও তত অধিক সুবিধা হয়। শিক্ষকের তিরস্কার বা ভৎর্সনা

যে মঙ্গলকামনাসম্ভূত, তাহা সকল ছাত্রেরই মনে করা উচিত। বিদ্যালয়ে যে সমুদায় নিয়ম প্রচলিত থাকে, তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে আমাদের যে সকল অভ্যাস বদ্ধমূল হয় তাহার বশে আমরা যে আজীবন কষ্ট পাই এরূপ নহে, অপরকে, সমাজকে ও দেশকেও অনেক সময় দুঃখের ভাগী করিয়া থাকি। অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে উহা আমাদিগের স্বভাবে পরিণত হয়। যে বালক বিদ্যালয়ে চুরি অভ্যাস করে, বিদ্যালয়ে অকথ্য লিখিয়া সুখবোধ করে, সহপাঠী দরিদ্রের বা সরল ভাবাপন্নের প্রতি উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হয়, বিদ্যালয়ের সুরক্ষিত উদ্যান নষ্ট করিয়া আনন্দ লাভ করে, এবং পাঠগৃহের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র ভাব কোলাহল দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া স্বকীয় চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়, সে বালক যে নিজ গৃহে অপহরণ করিতে প্রয়াস পাইবেনা, বা গুরুজনের অবাধ্য হইবেনা বা স্বকীয় বাস গৃহ অপরিষ্কৃত রাখিবে না কিম্বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে বালক যথাসময়ে আহার না করিয়া যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, তাহার যে কেবল অনেক বিষয়ে শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে এরূপ নহে, সে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন কার্য্যেই সময় মত উপস্থিত হইতে পারিবেনা। যে সময়ের মূল্য জানেনা, সে নিজ জীবনেরও মূল্য জানে না। কারণ জীবন কাল সময় পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। একে ত অহোরাত্রের এক তৃতীয়াংশ ভাগ কার্য্য করিবার সময় রূপে আমরা ব্যবহার করি, তাহার উপর যদি আমরা যৌবনের কর্ত্তব্য বার্দ্ধক্যে অনুষ্ঠান করিব, অথবা প্রভাত সময় আলস্যে কাটাইয়া প্রভাতের কার্য্য মধ্যাহ্নে সমাধা করিব, বলিয়া স্থির করি, কিম্বা নিরূপিত সময়ে নিরূপিত স্থানে উপস্থিত না হইয়া নিরূপিত কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সমগ্র জীবনই বিফল হয়।

বিদ্যালয়ে যে সমুদয় নিয়ম বহুদর্শিতা ও দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রচলিত রহিয়াছে, উহা যে আমাদের মঙ্গলের জন্য এ বিষয়ে সন্দিহান হওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে ধীর স্থির হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত আমরা কোন এক মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকি। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে, আমরা এক একটী সঙ্কল্পের আশ্রয় লই। কিন্তু ঐ সঙ্কল্পের মহান ছবি যখনই আমাদের মানস-পটের অন্তরালে চলিয়া যায়, তখনই আমরা আপনহারা হই এবং অসংযত হইয়া বেশভূষা, আহার পান, ইত্যাদি বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ক্ষেপ করিয়া থাকি। এই নিমত্তই আমাদিগের এরূপ বালকদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা উচিত যাহাদের সহিত বাক্যে ও মনে এরূপ মিল থাকা সম্ভব যে আমাদের পদস্খলন হইলে সে ব্যক্তি হস্তাবলম্বন দিবে এবং তাহার হইলে আমরাও দিতে পারিব।

আকাঙ্ক্ষা।

মানবজীবনে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহা পশু জীবনের সমান হয়, অর্থাৎ আহার, শয়ন, উপবেশন, সন্তানাদি পালন, ভিন্ন মানব জীবন লক্ষ্যহীন পশু জীবনের সমতুল হয়। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সঙ্কল্প আবশ্যক, এবং সঙ্কল্প পুস্তক পাঠে বা সংসর্গে মানব মনে জাগরূক হয়। কিন্তু সকল মনে সঙ্কল্প-বীজ সমভাবে উপ্ত হয়, কারণ অনেকের হয়ত অভিলাষ বা প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু উদ্যোগ বা অভিনিবেশ বা অধ্যবসায় নাই বলিয়া সিদ্ধি তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত হয়। সিদ্ধিও সফলতার সহিত আকঙ্ক্ষার সীমা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সম্পাদ্য বিষয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃষ্ট হইয়া না থাকিলে, অর্থাৎ যে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, সেই

বিষয়ে সম্যক অভিনিবিষ্ট না হইলে, সিদ্ধিলাভ হয় না। এবং সাধ্য বিষয়ে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইতে পারা যায় তাহা বাল্যাবধি নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা চেষ্টা বা অনুষ্ঠান করা উচিত। অভীপ্সিত ফললাভ করিতে যদি চেষ্টা ও পরিশ্রম না করিতে হইত, তাহা হইলে যে সকল উপায়ে আজকাল রেল, জাহাজ চলিতেছে, নিরবলম্ব আকাশ, স্থলপথের ন্যায় মানবের বিহার-ভূমি হইয়াছে, সুয়েজ যোজক প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যুৎ মানবের কিঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে সকল উপায় বা সে বিষয়ের কথা, সহজসাধ্য বলিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই শুনা যাইত। শিক্ষার দুইটী প্রশস্ত উপায় আদর্শ ও উপদেশ অবলম্বন করিয়া, আমাদের মনে যখন সঙ্কল্পের মহান ছবি অঙ্কিত হয়, তখন উহা সিদ্ধিযুক্ত করিতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অবশ্য প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে সম্পাদ্য বিষয় আমাদিগের ক্ষমতার বহির্ভূত কি না। যাহা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য, যাহার সাধনা করিয়া অপর মানবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং পূর্ব্বে যাহা অসাধ্য ছিল তাহা এখন যে কারণে সাধ্য হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রথমে আলোচনা ও পরে সাধনা করিলে মহত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু সংযম শিক্ষা করিয়া, সিদ্ধি ও সফলতার সহিত, ক্রমে ক্রমে আকাঙ্ক্ষার সীমা বৃদ্ধি করিতে করিতে, সৎপথে থাকিয়া আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হইলে, সফলতায় সাতিশয় সন্তোষলাভ করা যায় এবং বিফল হইলেও মনোমধ্যে এই সুখ বর্ত্তমান থাকে যে কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া বা কাহারও চক্ষে ধূলি না দিয়া সাধ্যমতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই চেষ্টার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অদৃষ্ট দোষে—কিন্তু নিজ দোষে ঘটে নাই।

সংসর্গ।

যোগী বা উন্মাদ ব্যতীত কোন মানবই একাকী থাকিতে ইচ্ছা করে না, এবং এই একত্র থাকিবার বাসনা যাহাকে সংসর্গানুরাগ কহে, উহা সকলেই বলবতী। কিন্তু তরুণ বয়স্কেরা জীবনের প্রথম অবস্থায়, যখন মনের "প্রথম আনাগোনা হয়", তখন বুঝিতে পারে না, যে কোন্ ব্যক্তির সংসর্গে থাকা উচিত বা উচিত নহে। তাহারা গৃহে মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজনের সহিত সরল ও অকপট মনোভাব বিনিময় করিতে অভ্যস্ত হইয়া, যাহাদের সহিত প্রথম মিশামিশি করে, তাহাদের সহিতও মনের কথা ঐ ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জগতে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, সারল্যের সুযোগ দেখিয়া অনেকে স্বকীয় প্রকৃতভাব গোপন করে এবং প্রথমে বালক যে সকল কথা ভালবাসে, সেই জাতীয় কথা কহিয়া, ক্রমে তাহার যে বিষয়ে মনের জোর অল্প, সেই বিষয়ে তাহাকে চালিত করিয়া, দুষ্ট বালকেরা তাহাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লয়। একবার কিন্তু তাহাদের কোন একটি মন্দ কর্ম্মে সহযোগী হইলেই বালক কেন, মানব প্রকৃতি, তাহাদের অন্যান্য মন্দ কর্ম্মেও বিরক্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না। সৎসঙ্গে যে মঙ্গল এবং অসৎসঙ্গে যে অমঙ্গল, এ বিষয়ে বারম্বার শ্রুত হইলেও, অনেক সময় বালকেরা কোনটি সৎ এবং কোনটি অসৎ তাহা নির্ণয় করিতে পারে না, এবং অসৎটি নির্ণয় করিতে পারিলেও, যদি সে মন্দ কর্ম্মে একবার লিপ্ত হয়, তাহা সহজে প্রকাশ করিতে সাহসী হয় না। এরূপ স্থলে প্রথমাবস্থায়, মাতা পিতা বা গৃহের অন্য কোন প্রবীণ বা প্রবীণার, এবং পাঠগৃহে শিক্ষকের, প্রখর দৃষ্টি আবশ্যক। তাঁহারা যে সকল কার্য্য করিতে নিষেধ করেন না, সুকুমারমতি বালক বালিকারা তাহা দূষণীয়বলিয়া অনুমান করে না। বাস্তবিক পক্ষে শাসন, বালক

বালিকাদের সদসৎ নির্ণয় করিবার শক্তি প্রদান করে।

ছাত্রজীবনে কিন্তু সতীর্থগণই প্রধান সহচর। এবং বিদ্যালয়ে দুষ্ট প্রকৃতির বালকের সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ অনেকে বালকদিগকে গৃহে শাসন করিতে না পারিলে, বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে গৃহে বালক শাসিত হইতে পারে না, সে গৃহে শাসন নাই, অথবা যদি থাকে, উহা ব্যবস্থামত শাসন নহে। এই সকল গৃহের বালকদের সংসর্গে বিদ্যালয়ে অপর বালকদের প্রকৃতি দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পারিবারিক কুশিক্ষার ফল হইতে রক্ষা পাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

ছাত্র-জীবন যত অগ্রসর হইতে থাকে, সংসর্গ-নির্ব্বাচনের ভার অনেকটা নিজের উপর আসিয়া উপস্থিত হয়। শৈশবে যদি ভিত্তি পাকা হইয়া থাকে, মৃদু মৃৎপিণ্ডবৎ কোমল হৃদয় যদি কোন সুঠাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গাথনি স্থায়ী হইবে, মৃৎপাত্র অগ্নি পরীক্ষায় স্থিতিলাভ করিবে। সংসর্গের সুফল বা কুফল শৈশব হইতে যৌবনান্তে, এমন কি বার্দ্ধক্যেও ভোগ করিতে হয়। শৈশবের স্মৃতি যেরূপ চিরসঙ্গিণী, যেরূপ আনন্দদায়িনী ও যেরূপ নানা বিষয়িণী চিন্তার বিক্ষোভেও সর্ব্বদা হৃদয়পটে মুর্ত্তিমতী, এরূপ আর পরজীবনের কোন স্মৃতিও নহে। এই বয়সে যদি উপদেশ অথবা শত উপদেশ সম সুদৃষ্টান্তের বা আদর্শ-চরিতের অনুকরণে নৈতিক জীবনের গতিপথ, পাষাণ-গাত্রে গভীর রেখাপাতের মত সুদৃঢ় হইয়া থাকে—যদি সুশীল বালকের সংসর্গে প্রকৃতি সুশীল হইয়া থাকে—যদি সৎসঙ্গে, সাধু সঙ্কল্পে, ও সচ্চিন্তায় বাল্যজীবন মধুময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুঃশীলতা বা দুরপনেয় কুপ্রবৃত্তি, কখনই হৃদয় মধ্যে অধিকার স্থাপন করিতে পারে না। সত্যবাদী, শান্ত, শিষ্ট, স্বাবলম্বী, সৎশিক্ষানুবর্ত্তী সহপাঠীর

সঙ্কটে সংবিভাগী বা অভিন্নহৃদয় হইলে যে কেবল নিজ নৈতিক জীবনে সুখানুভব করা যায়, এরূপ নহে, শৈশবসৌহার্দ্দ সমভাবে সহচর হইয়া, গার্হস্থ্য জীবন সৎসঙ্গের সুমধুর সুধাস্বাদে স্বর্গীয় সুখময় হইয়া থাকে। জগতে কিন্তু এরূপ সংসার, এরূপ মিত্রতা, এরূপ সুযোগ, এরূপ দুর্লভ সঙ্গ, কয়জনের ভাগ্যে মিলিয়া থাকে? কয়জন শৈশবে প্রবীণ বা প্রবীণাদের দ্বারা কোনটী সৎ বা কোনটী অসৎ, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? কয়জনই বা মাতাপিতার ইচ্ছায় অথবা তাঁহাদের অভাবে উপযুক্ত গুরুগৃহে স্থাপিত হইয়া তাঁহার সদাচার প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছে? এবং কয়জনই বা কথিত হইয়াছে যে তুমি নিরূপিত পাঠবিষয়ে অল্পধারণাসম্পন্ন হইলেও সংসর্গই সমাজ ও রাজার সম্ভ্রম সংস্থাপনে তোমার প্রধান বল হইবে। যাহারা এরূপভাবে গুরুজনের বা শিক্ষকদের খরতর কর্ত্তব্যদৃষ্টিতে পতিত হয় নাই, তাহারা প্রায়ই কুসঙ্গজাত কদভ্যাসের মোহিনী মায়া হইতে উন্মুক্ত হইতে পারে নাই। অথবা ঘটনাক্রমে অতি শোচনীয় দীন দশায়, কিম্বা নির্জ্জন স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় নিপতিত হইলেও সুখ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জীবন যাপন করিতে পারে নাই। কুশিক্ষা যত সহজ সুশিক্ষা তত সহজ নহে। এ কারণে যাহারা শৈশবে সাহায্য-লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কুনীতিসম্পন্ন। তবে যাহারা বিনা সাহায্যে অথবা অল্প সাহায্যে, নৈতিক জীবন ক্রমিকই উন্নত করিতে থাকে, তাহাদের মনের বল অধিক, তাহাদের স্বকীয় দৃষ্টি ও মানসিক আলোচনা অসাধারণ। এই কারণে সত্যবাদী শিক্ষানুবর্ত্তীর সঙ্গী সেই জাতীয় হয় এবং দুঃশীল, মিথ্যাবাদী, শিক্ষায় অমনোযোগীর সঙ্গী সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে। কোন মহাশয় ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন "তুমি কিরূপ লোকের সংসর্গে থাক, তাহা জানিতে পারিলে, তোমার কিরূপ চরিত্র তাহা বলিয়া দিব।" অপর একজন লিখিয়াছেন "তুমি কিরূপ লোকের সহিত মিত্রতা কর,

কিরূপ পুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাস, এবং কিরূপ চিত্র দেখিয়া সুখী হও, তাহা অবগত হইলে তোমার চরিত্র বুঝিতে পারিব।”

বাস্তবিক পক্ষে সাধু ব্যক্তি সহবাসে যে রূপ সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেইরূপ সৎগ্রন্থ পাঠে ও সদ্ভাবোদ্দীপক চিত্র অবলোকনে উত্তম সংসর্গ লাভ করা যায়। ইহারা আমাদের নির্জ্জীব সঙ্গী। অবশ্য কুপুস্তক বা কুচিত্র নহে। কি বিপদে কি সম্পদে সাধু সঙ্গলাভে যে সুখ সম্ভোগ করা যায়, সদ্গ্রন্থ পাঠেও সেই সুখ ভোগ করা যায়। আজি কালি বঙ্গদেশে অসৎ গ্রন্থের অভাব নাই, অতএব সৎসঙ্গ-নির্ব্বাচনে যেরূপ গুরুজনের ও শিক্ষকের প্রখর দৃষ্টি আবশ্যক, সেইরূপ অসৎগ্রন্থের আবিলস্রোত হইতে বালকদিগকে উদ্ধার করা উচিত। অনেকে বাহ্যে সৎসঙ্গ করিয়া গোপনে অসৎপুস্তক পাঠ করে। কিন্তু ইহাতে যে গোপন ভাবে অসৎ সংসর্গ করা হয়, ইহা তাহাদের জানা আবশ্যক। নচেৎ স্বত্ত্বগুণ ও নৈতিক আদর্শ সমন্বিত মহাজন-চরিত ইত্যাদি সদ্গ্রন্থাদি না পড়িয়া অসৎগ্রন্থ পাঠ করিলে আপনাদিগকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

শিষ্টতা।

বাল্যকাল অবধি শিষ্ট হইতে এবং কথার বাধ্য হইতে অভ্যাস না করিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায় না। বাল্যকালে আমরা যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাই অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, অনুকরণ করিয়াই আমরা বড় হই; এবং বড় হইতে হইতে ক্রমে আমরা বুঝিতে পারি কোন বিষয় অনুকরণ করা উচিত বা অনুচিত।

মনুষ্য ও পশুতে যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্নেহ ও মমতা এবং হিতাহিত জ্ঞানই প্রধান। স্নেহ ও মমতায় মানব মাত্রই

সন্তানসন্ততির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। বাল্যকালে অনায়াসে অথবা কেবল মাত্র ক্রন্দন করিয়া লভ্য বস্তু পাইতে পাইতে আমাদের এরূপ অভ্যাস হয়, যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া কোন সামগ্রী পাইতে বা বিদ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমাদের অনেক পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে পরিশ্রম ব্যতীত কোন সামগ্রী বা কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না, তাঁহারা আমাদিগের হিতার্থ কতকগুলি শাসনের গণ্ডির মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে বলেন। এই শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যখন উহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি এবং বিনা শাসনে সেইমত কার্য্য করিতে পারি তখনই আমাদের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। এই শাসনের বাহিরে গিয়াও আমরা আবার ফিরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে যে সময় চলিয়া যায় উহা আর ফিরিয়া আসে না। আমরা যদিও আজীবন শিক্ষার অধীন তথাপি আমাদের জীবন-কাল এত সংক্ষিপ্ত যে প্রতিবার ঠেকিয়া শিখিতে গেলে আমাদের নূতন কোন পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়। সেই নিমিত্ত বহুদর্শীদের শাসনে অভ্যস্ত হওয়াই প্রার্থনীয়।

বাল্যকাল প্রথম পাঠাভ্যাসের সময়। এই সময়ের সদ্যোমথিত নবনীতবৎ কোমল হৃদয়ে যে প্রকার ছাপ দেওয়া হইবে, সেই ছাপই ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু সেই বয়সেই ধীবর-পুত্রের মৎস্য ধরা দেখিয়া মনে হয় না জানি সে কতই সুখী। কারণ তাহার মৎস্য ধরিবার বাসনায় বাধা দিয়া কেহ তাহাকে পড়িতে বলিতেছে না। কে তখন জানে পরে মনে হইবে, হায়, প্রথম হইতে যদি অধিক পড়া শুনা করিতাম আজ আমি কত অগ্রসর হইতাম। বহুদর্শী আত্মীয়েরা বা শিক্ষকেরা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের শাসনের মধ্যে আমাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করেন, কারণ, পরে আমাদিগকে আক্ষেপ করিতে হইবে না।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ক্রীড়ার আপাত মধুর সুখ লালসায় আমরা যখন প্রবৃত্ত হই, তখন গুরুজনশাসন আসিয়া আমাদিগকে বাধা দিলে কতই মনের কষ্ট হয়। কিন্তু গুরুজনেরা দেখিয়াছেন যে উহা পরিণাম কঠোর। বালক-হৃদয় সে কঠোর পরিণাম অনুভব করিলেও পুনর্বার ক্রীড়া করিতে নিরস্ত হয় না। হিতাহিত-জ্ঞান হইলেও বাসনা-পরিতৃপ্তির লালসা প্রবল হইলে অনেক সময় লোভ সম্বরণ করা ক্লেশকর বোধ হয়। শাসনে অভ্যস্ত হইলে লালসা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুমিত হয় এবং গুরুজন-নিদেশবর্ত্তিতা বা কথার বাধ্য হওয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া, তদ্বিরোধিকর্ম্মগুলি পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। পরকে মারিলে বা গালি দিলে, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে, গুরুজনের অবাধ্য হইলে যে, তাঁহাদের মনে কষ্ট হয় এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হিতাহিত জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না সেই জ্ঞানের উদয় হয়, ততদিন অবাধ্য হইয়া জগতের সুখ শান্তিকে ভগ্ন করিলে অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। এই অনিষ্টাপাত নিবারণ-কল্পে শিক্ষকের আদেশ-পালনই মঙ্গলময়। এই শাসনপালনের সার্থকতা অনুভব করিলে, ও ভবিষ্যজীবনে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া জীবন-পথ অনুসরণ করিলে, মনুষ্য চরিত্রবান হইয়া থাকেন। এই নিদেশ-বর্ত্তিতার অভ্যাস বশতঃ পরে তিনি স্বতঃই দয়ার পাত্র দেখিলে তাহাকে দয়া করেন, প্রণম্য দেখিলে প্রণাম করেন, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া সে পাপ কার্য্য করেন না, বিনা পরিশ্রমে কোন সামগ্রী লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, মিথ্যা কথায় মনের শান্তি দূর না হইয়া পরের অনিষ্ট হয় বলিয়া সত্য কথা বলেন, সারল্যের চিরন্তন সুখ ভোগ করিয়া কপট হইতে ইচ্ছা করেন না, আমোদপ্রমোদ আপাতমধুর বলিয়া সুখের অন্বেষণ করেন, দূষণীয় সংসর্গ পরিত্যাজ্য বলিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিতে থাকেন, স্বার্থে বাধা পড়িলেও

বিদ্যাসাগরের মত কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন, এবং দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। তিনি দেশপূজ্য ও সমাজপূজ্যদের নির্দেশবর্ত্তী হইয়া এরূপে দলপুষ্ট করিতে পারেন। যে তাহার শক্তির প্রভাবে অন্যান্য অবাধ্য শক্তি বাধ্য হইয়া পদপ্রান্তে আসিয়া নতশির হয়।

স্বাবলম্বন।

পরের মুখাপেক্ষী বা পরপ্রত্যাশী না হইয়া, অথবা পরের সাহায্য না লইয়া আপনার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য সম্পাদন করার নাম স্বাবলম্বন। প্রতিপালন-পদ্ধতির উপর বাল্যকালে স্বাবলম্বন-অভ্যাস নির্ভর করে। প্রতিপালন হইতে হইতে যাহারা অনায়াসে লভ্যবস্তু পাইতে থাকে, তাহাদের ক্লেশ স্বীকার করিয়া উহা লাভ করিতে কখনই ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ মানসিক আত্মনির্ভর সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, যাহারা সর্ব্বদা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ই বোধগম্য করিতে পারে না, তাহাদের নিকট পাঠ্য বিষয় সকল অথবা অনুশীলন ইত্যাদি সর্ব্বদাই দুর্ব্বোধ্য হয়। বাস্তবিক পক্ষে শিশু যে দিন কাহারও বাহু অবলম্বন না করিয়া নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া নিজে দাঁড়াইতে শিক্ষা করে, সেইক্ষণ তাহার জীবনের একটী মাহেন্দ্রক্ষণ। সেইরূপ শিক্ষার্থীরা যে দিন অভিধানের ও পুরাতন শিক্ষার ফলে একটি নূতন শিক্ষা অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়, সে দিন হইতে তাহার মনে যে আত্মশক্তির বিকাশ পায়, তাহার জীবনে তাহা যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দেয়। এ সংসাররূপ জীবনসংগ্রামক্ষেত্রে, উপযুক্ত ব্যক্তিরাই স্থিতিলাভ করে এবং আত্মনির্ভর না হইতে পারিলে উপযুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার হয়। অলস

পরাবলম্বীর প্রতি এ জগতে কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এ সংসারে সকলেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত বলিয়াই এবং সকলকেই স্বকীয় শক্তি-বলে আপন আপন গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয় বলিয়াই, নিতান্ত অলস ও শ্রমসমর্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার তাহাদের অবকাশ নাই। এমন কি যাহারা অবস্থার দাস হইয়া দৈবের উপর নির্ভর করে এবং আত্মনির্ভর বা পুরুষকারকে নগণ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগকে মানব কেন ভগবানও সাহায্য করেন না। কর্দ্দম-প্রোথিত শকট চালক যখন শক্তির দেবতাকে আরাধনা করিয়াছিল, তখন দেবতা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন যাহারা নিজেকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, অথবা যাহারা স্বকীয় সিদ্ধিলাভ করিতে সচেষ্ট, ভগবান তাহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যক্তি চিরকাল পরের কোমর ধরিয়া সাঁতার দেয়, সে ব্যক্তি কখনই সাঁতার শিখিতে পারে না এবং যে বালক পুরাতন শিক্ষা হইতে লাভবান না হইয়া, গুরুর উপদেশে অমনোযোগ পূর্ব্বক, প্রাত্যহিক নূতন পাঠের আপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শিক্ষকের দ্বারা সাধন করিয়া লয়, সে বালকও কখনই শিক্ষা করিতে পারে না, এবং যদি বা শিক্ষকের সাহায্যে কোনরূপে দিনের মত শিক্ষা করিতে পারে চর্চ্চা ও অভিনিবেশের অভাবে তাহার শিক্ষা স্থায়ী হয় না, অথবা হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ কখনই অঙ্কুরিত হয় না।

অপরের সাহায্যে যে কোন কার্য্যই কর না কেন, তাহাতে মনের প্রসন্নতা কখনই জন্মিবে না। সর্ব্বদাই মনে হইবে সকল বিষয় বুঝি দুর্ব্বোধ্য, সকল ব্যাপারই বুঝি কঠিন এবং সকল সাধনাই বুঝি দুঃসাধ্য, অথচ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া পরের কিছু সাহায্য লইলেও হৃদয়ে আনন্দভাব উদ্বেলিত হয় এবং আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অমিয়-সুখ উপলব্ধি করা যায়, কারণ গুরুভার মস্তকে লইতে

গেলে ভাববাহীকেও অপরের সাহায্য লইতে হয় এবং গুরূপদেশ ব্যতীত শিক্ষার পথ কখনই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিতে অভ্যাস না থাকিলেও, অবস্থাভেদে সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে অথবা পরস্পরের সাহায্যকল্পে ঐরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা সঙ্কীর্ণতামাত্র এবং মর্য্যাদার ভুল বিশ্বাসের লক্ষণ। জনাকীর্ণ পথে একখানি শকট ভগ্ন হইলে রাস্তায় চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং উভয়দিক গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের অকারণ সময় নষ্ট হয়। এ স্থলে পরস্পরের সাহায্যে কায়িক শ্রমে শকটস্থানান্তরিত করা উদারতার লক্ষণ। ভৃত্যাভাবে বা রোগীচর্য্যার্থে অবস্থামত কোন নীচ কর্ম্ম করিলে সমাজ কি মনে করিবে, এরূপ ধারণা মানসিক অপকর্ষ সূচক।

নৈতিক সাহসের অভাবে এবং মর্য্যাদাহানির ভুল বিশ্বাসে কত সুকুমারমতি বালক হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। বিদ্যালয়ে অপরের প্রতিভার সুখ্যাতি শুনিয়া কত বালক যে আত্মশক্তির উপর হতবিশ্বাস হয়, তাহা কয়জন উপলব্ধি করিতে পারেন? কত বালক কয়েকটী কবিতা নির্ভুলে আবৃত্তি করিয়া বা গণিতের কয়েকটী প্রশ্নের সমাধান করিয়া এরূপ প্রতিভার গৌরবে স্ফীত হয়, যে তাহা দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি বালকেরা নিস্পৃহ হয়, এবং পাছে অপরে তাহাকে স্থূলবুদ্ধি মনে করে, এই ভাবিয়া "কে আমি আমার আছে কি রতন" এ বিষয় অনুসন্ধান না করিয়াই আজীবন মূর্খ থাকিতেও দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিভাবান বালকেরা সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানের ভাণ করিয়া, শ্রমশীলতায় নির্ভর না করিয়া, আত্মশক্তির উপর ভুল বিশ্বাসে অনেক সময় ভাবী জীবন-ক্ষেত্রে নগণ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাদের অলোকসামান্য ক্ষণপ্রভাবৎ প্রতিভায় ঝলসিত

হইয়া যাহারা নিঃস্পৃহ হয় এবং এই কারণে আত্মশক্তির উপর আস্থাশূন্য হয়, তাহারা জানেনা যে অসাধারণ বুদ্ধিতে বঞ্চিত হইলেও তাহারা মনের শক্তির অনুশীলনে উহাকে কত উন্নত করিতে পারে। এই উন্নীত শক্তি প্রতিভার স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং জাজ্জ্বল্যমান সাফল্যের আশাপথ উন্মেষিত করিতে পারে।

আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে, বাধাবিপত্তিতে চঞ্চল না হইলে, পরমুখাপেক্ষী হইবার ইচ্ছা মনে স্থান পায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, ক্রমবিকাশ আরম্ভ হইলে স্বাবলম্বন, অভ্যাস অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বাবলম্বন অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইলে, পরকীয় সাহায্য অনাহূত বলিয়া মনে হয়। রাজনীতিজ্ঞ দার্শনিককুলচূড়ামণি মহামতি বার্ক বলিয়াছেন যে "আমাদের বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত ও আমাদিগকে যিনি অধিক স্নেহ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা পিতৃতুল্য অভিভাবকের প্রশস্ত নিয়মানুসারে, বাধা বিপত্তি ও অন্যায়গুলি আমাদের শিক্ষকের স্থানীয় হইয়াছে। যিনি আমাদের সহিত মল্ল যুদ্ধ করেন, তিনিই আমাদের স্নায়ু সবল ও নৈপুণ্য সুতীক্ষ্ণ করেন। আমাদের বিপক্ষই প্রকারান্তরে আমাদিগকে সহায়তা করেন। বাধা বিপত্তির সহিত বিদ্বেষহীন বলপরীক্ষা করিলে অভিলষিত ও অধিগম্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং উহা দ্বারা বাহ্যদর্শী ও পল্লবগ্রাহী না হইয়া, নানা দিগ্‌দর্শী সদ্বিবেচক হওয়া যায়।"

আত্মনির্ভরশীল হইলে কেবল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-সুখ অনুভব করা যায় তাহা নহে, বন্ধু ও পরিচিত মহানুভবগণের নিকট যে সকল প্রস্তাব করা যায়, সে গুলি স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া সন্দেহের বিবশীভূত হয় না, পরন্তু বিবেচনাযোগ্য বলিয়া সে গুলি সাদরে গৃহীত হয়। সৎসাহস ও কর্ত্তব্য জ্ঞান স্বাবলম্বের নিত্য সহচর এবং সহিষ্ণুতা তাহার

অভ্যস্ত বিষয়ের অন্তর্ভূত হয়, দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করা কখন তাহার মনোমত হয় না, তখন বিলাস-ভোগ-বাসনার সংযম পথ অনুদ্ঘাত বলিয়া মনে হয়,—কেবল জীবনধারণোপযোগী সামগ্রীই লভ্যবস্তু এবং অন্যান্য সামগ্রী পরিত্যজ্য বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। অপরের সুখসমৃদ্ধিতে ঈর্ষার বশবর্ত্তী না হইয়া তিনি উদ্যোগ ও অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও অভিনিবেশ, সৎসঙ্গ ও সদগ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা অনুভব করেন, হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পরিপোষণ করিয়া, অভিলষিত ও অধিগম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহা লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে যত্নবান হয়েন, এবং যতদিন না উপযুক্ত হয়েন, ততদিন অপ্রাপ্তি হেতু খেদ করা মূর্খতা বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের অনুকরণে পরমুখাপেক্ষিগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে না পারিলে সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব শ্রী পরিলক্ষিত হয় এবং পরিশ্রম না করিয়া অপরের শ্রমলব্ধ সামগ্রী-লাভের ইচ্ছা সমাজ হইতে দূরীকৃত হইয়া যায়। অধিকন্তু অবিরাম ব্যক্তিগত পরিশ্রমের ফলে দেশে বীণাপাণির বরপুত্রদের অভাব অনুভূত হয় না এবং নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধির প্রকাশে দেশে এত অধিক সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে থাকে এবং পরিশ্রম সংক্ষেপের কলকারখানা ও প্রস্তুতিব্যয়ের সংক্ষেপ কল্পে এত প্রকারের উপায় উদ্ভাবিত হয়, যে কমলার ললিত উদার হাস্যে সমগ্রদেশ উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

অতএব কি বিদ্যালাভ করিতে, কি সংসারে কৃতকর্ম্মা হইতে, কি সমাজের উন্নতি সাধন করিতে, যত বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায় উপস্থিত হউক না কেন, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যখনই উহার সম্মুখীন হইবে, ফিরিয়া দাঁড়াইও না, কারণ,

"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে?"

দৈব আমার উপর অনুকূল নহেন এরূপ ভাবিয়া মনকে কখনও প্রবোধ দিও না। অবস্থার দাস না হইয়া, অবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সফলকাম হইবে। আত্মনির্ভর করিয়া প্রত্যেক বার পর সাফল্য লাভে এরূপ আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে জয়লাভ, অভ্যাসের অন্তর্গত হইবে, এবং এইরূপ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে বিজয়-সুখ অদূরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সময়ের ব্যবহার।

জন্ম গ্রহণ করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মুহূর্ত্তেই মানব কোন না কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত। যখন জন্মাইবার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের জীবন-কাল, তখন সেই বৎসর গুলি বা তাহার দ্বাদশগুণ মাস গুলি বা তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি গুণ দিন গুলি বা সেই দিন গুলির চব্বিশ গুণ ঘণ্টা গুলি বা সেই ঘণ্টা গুলির ষাট গুণ মিনিট গুলি বা সেই মিনিট গুলির ষাট গুণ মুহূর্ত্ত গুলি মানবের জীবন কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই মুহূর্ত্ত গুলিতে যদিও কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মানুষে জীবন কাল কাটাইয়া যায়, তথাপি যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তাহা সকলের পক্ষে কখনই সমান নহে। পশু পক্ষীরাও জীবন কালের সকল মুহূর্ত্তেই ব্যাপৃত। অতএব বিচার শক্তি হীন পশুর মত যদি জীবন কাল অতিবাহিত করা যায়, তাহা হইলে মানবে ও পশুতে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। নিতান্ত আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া অবশ্য সকল সভ্য মানবই পশু হইতে পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান ইত্যাদি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়া সাধারণ মানব হইতে নিজের পার্থক্য প্রতিপাদন করিতে অল্প মানবেই চেষ্টাবান হয়েন।

যদি অধিক সংখ্যক মানব এই দিকে আকর্ষিত হইত তাহা হইলে এ জগতেই স্বর্গসুখ অনুভব করা যাইত।

অধিক বিদ্যায়, জ্ঞানলাভে, চিত্তের উৎকর্ষ-সাধনে, চরিত্র-গঠনে, ন্যায় পথে অর্থ-উপার্জ্জনে, আদর্শ পরিবার-প্রতিপালনে এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ইত্যাদি মহৎ অনুষ্ঠানে সাধারণ মানব হইতে পৃথক হইতে গেলে, এক এক মুহূর্ত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উহাকে অনন্ত মুহূর্ত্তে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তটী চলিয়া যায়, সেটী আর ফিরে আসে না। যাহার শরীরে আলস্য নাই, যাহার মানসিক শ্রমে অবহেলা নাই, এবং যাহার জ্ঞান বা বিদ্যা বা ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই মুহূর্ত্ত গুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারে। সমাজে ও সংসারে বাস করিতে হইলে কিন্তু অনেক বাধা ও অনেক বিপত্তি। এই নিমিত্ত যাহারা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা দৈনন্দিন জীবন, কোন নিয়মের অধীন করিয়া রাখেন। এই স্বকীয় নিয়মের অধীন না হইলে সকল অনুষ্ঠান গুলি সম্পন্ন হইতে পারে না। কলিকাতার অনেক এটর্ণী আফিসে "Time is money" লিখিত থাকে। বাস্তবিক কি অধ্যবসায়ী, কি ব্যবসায়ী, সকলের পক্ষেই, সময় অতি মূল্যবান। অথচ এরূপ অনেক লোক আছেন যাহারা সময়ের মূল্য কিছুই বুঝেন না। কেবল সাহেবদের সহিত দেখা করিতে হইলে, অথবা আফিস যাইতে হইলে, কিম্বা ট্রেণ ধরিতে হইলে তাহারা সময়ের মূল্য বুঝিতে পারেন। তাহারা সময় মত আফিসে পঁহুছাইয়াই আবার সময়ের মূল্য ভুলিয়া যান। হাতের কর্ম্ম অসমাধা রাখিয়া গল্পে প্রবৃত্ত হয়েন ও উপরওয়ালার নিকট দুই এক কথা না শুনিয়া পুনরায় কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন না। এই অমূল্য সময় যাহাতে শীঘ্র কাটিয়া যায় এই শ্রেণীর লোক তাহাই, কামনা করে।

তাহারা সাহেবের সহিত সময় মত দেখা করিয়া আবার সময়ের মূল্য ভুলিয়া যান, এবং অবান্তর কথা কহিয়া সাহেবের সময় নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে সাহেবকে বারম্বার ঘড়ি খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হয়।

আমাদিগের জীবন-কাল এত সঙ্ক্ষিপ্ত, যে সে সময়ে আমরা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান ও অতীত কালের সুধিগণ চিন্তা-পরম্পরার ফল রূপে যে সকল বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে সেইগুলি শিক্ষা করিয়া তবে অন্য মৌলিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অধ্যবসায় ও কর্ম্মসমাপ্তির সহিত আমাদিগকে কিন্তু শরীর, সমাজ ও সংসারের বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ কারণে সকল কার্য্য গুলি সুসম্পন্ন করিতে হইলে সময়ের মূল্য আরও অধিক বলিয়া অনুভূত হয়। সকল কাজেরই সময় করিয়া লইতে হইলে কাজে কাজেই পূর্ব্ব হইতে কোন সময় কিরূপে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহা স্থির করা উচিত। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সার উইলিয়ম জোন্সের বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন "১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, যে রূপ দিবস যাপন করিতেন, তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে, উহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালে, সর্ব্বপ্রথম, একখানি পত্র লিখিয়া, বাইবেলের কতিপয় অধ্যায় পড়িতেন, তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকারণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, মধ্যাহ্ন কালে ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ, অপরাহ্নে রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত, সর্ব্বশেষে দুই চারি বাজি সতরঞ্চ খেলিয়া, ও ইটালি দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি এরিয়ষ্টোর প্রণীত কাব্যের কিয়দংশ পড়িয়া দিবাবসান করিতেন।" অনেক মহাত্মা এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া, আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং জগতে কীর্ত্তি রাখিয়া অমর

হইয়াছেন। একজন কবি এই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে দিয়া নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিয়াছেন :—

"We are but minutes Use us well ,
For how we are used we must one day tell
Who uses minutes, has hours to use ,
Who loses minutes, whole years must loose"

বাস্তবিক মিনিটগুলির ঠিক ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা এ কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকর্ম্মা বালকেরা পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই বুঝিতে পারে। পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলে বালকেরা মনে মনে খেদ করে "হায় যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতাম, আজ সফলমনোরথ হইতাম।" এই নিমিত্ত রোমক রাজ্যের অধিপতি মহাত্মা টাইটাস্ একদিন একটী কার্য্য করিতে বিস্মৃত হওয়াতে "আমি একটী দিন হারাইলাম" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

জীবদ্দশায়, গল্প, ক্রীড়া, নিদ্রা, আহার, কলহ প্রভৃতি কার্য্যে যদি অধিক সময় ক্ষেপণ করা যায়, এবং অবশিষ্ট সময় যদি উৎসব, সম্মিলন, রোগ শোক ইত্যাদি সাংসারিক ও সামাজিক কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চার সময় করিয়া লইতে পারা যায় না, তাহা হইলে সাধারণ মানব হইতে পৃথক হইবারই বা অবকাশ কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে মুহূর্ত্ত গুলিতে সুকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে, সে গুলি চলিয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যতে অনুতাপ করিলেও আর অসম্পাদিত কর্ম্ম সম্পাদনের সময় থাকিবে না। যে সময় সুকার্য্যে অতিবাহিত হয়, সেই সময় জীবন যেন সার্থক বোধ হয়, এবং এইরূপে সময় অতিবাহিত হইলে ভবিষ্যতেও অনুতাপের কারণ উপস্থিত হয় না। এই কারণে মহামতি কার্লাইল লিখিয়াছেন, Labour is life There is always

hope in a man that actually and earnestly works; in idleness alone is their perpetual dispair   Blessed is he who has found his work, let him ask for no more blessedness.

পরোপকার।

পরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি সকল লোকে সমভাবে দেখা যায় না। জগতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকলেই স্বার্থপর। যিনি অত্যন্ত স্বার্থপর তিনি অপরের স্বার্থে উদাসীন হইয়া স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে যত্নবান হয়েন। তাহাদের এরূপ ধারণা যে, বিধবা, অনাথ ও বিপন্নজনের প্রতি দয়া করা, করা বা ঋণদায় হইতে ঋণীকে উদ্ধার করা, বা দুইটী মুখের কথায় যদি কাহারও অন্ন-সংস্থান হয়, এরূপ চেষ্টা করা, বা রোগীর চিকিৎসা, ঔষধি, পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা, বা পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করা, ইত্যাদি পরের উপকার করিবার বাসনা, যে মুহূর্ত্তে মনে উদিত হইবে, তখন হইতে বুঝি স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথে কণ্টক পড়িবে, বিলাস-বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এবং দারা সুতের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে ব্যাঘাত ঘটিবে। মায়া-মমতা-শূন্য পশু, প্রাত্যহিক আহারের অনিশ্চিততা হেতু স্বার্থপর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে থাকিয়া অপরের সহানুভূতি লাভ করিয়া, কোন কোন ব্যক্তি যখন একেবারে স্বার্থপর হয়, তখন তাহাদের মঙ্গল বা উন্নতিতে সংসারের, সমাজের, বা স্বদেশের কোন উপকার হয় না। যদিও অনেকে তাহার ত্রিসীমায় যাইতে চাহে না, তথাপি তাহার বিপদে, আপদে, কতকগুলি লোক সাহায্য করিয়া থাকে। তাহার সাহায্যকারীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া

যায়, যে কতকগুলি তাহার অধীন, কতকগুলি নিতান্ত আত্মীয়, এবং কতকগুলি স্বার্থশূন্য এবং সেইজন্য প্রত্যুপকার আশা করেন না। এই সকল দেখিলে, শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পরের দুঃখে নিজদুঃখ অনুভব করেন এবং পরের সুখে নিজে সুখী হয়েন, এমন কি অপরে পাছে কষ্টে পড়েন ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতে সৎপরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। পরোপকার প্রবৃত্তি তাহাদের এমনই প্রবল, যে তাঁহারা যেরূপ হীনবস্থায় বা দুর্দ্দশায় নিক্ষিপ্ত হউন না কেন, মানবমঙ্গলসমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে তাঁহারা কোন কারণেই পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আবার কমলার ক্রোড়ে শায়িত, অথবা অধ্যবসায়ী এবং উত্তমশীল, অথবা কোন কর্ম্ম সূত্রে দেশের সঙ্গতিপন্ন লোক সমূহের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের দ্বারা এত অধিক উপকার সাধিত হইতে পারে, যে তাহার ফলে স্থান বিশেষের ক্ষুধার্ত্ত বা পীড়িত, বস্ত্রহীন বা আশ্রয়হীন বা বিদ্যার্থী, সকলেরই নিজ নিজ অভাব হেতু তীব্র যাতনাভার লঘু হইয়া যায়। তখনই মনে হয় মানবজন্ম মানব-মঙ্গলের নিমিত্ত। বিশ্বনিয়ন্তার জগৎ-হিতকর অনুষ্ঠান মধ্যে মানব-জন্মও বিষয়ীভূত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে ছায়াদান করিতে তরুর মত—বিভাবরীর তমসা নাশ করিয়া মানব মনে সুখ দিতে শিতাংশুর মত, এবং প্রভাতে নব তেজ ও নব জীবন দান করিতে দিবাকরের মত, মানব জীবনের সম্ভব হইয়াছে। যদি তাহাই না হইল তাহা হইলে মানব জন্মের সার্থকতা কি?

পরোপকার-প্রবৃত্তি নিজগৃহে প্রথম উন্মেষিত হয়। পরে উহার ফলে জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে থাকে। বাল্যকালে নিজ গণ্ডির মধ্যে যাহাদের নিত্য দেখিতে পাই, তাহাদের কষ্ট অপনোদন বা তাহাদের সুখ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে আমরা উপকার করিবার নানাবিধ পন্থা অনুসরণ করিতে শিক্ষা করি। ক্রমে আমাদের মধ্যে জন

কয়েকের উপকার করিবার সামর্থ্য-লাভের ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া, যাহারা সাধ্যমত পরোপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সকল মহাত্মা, মানব-জন্মের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপার্জ্জন কেবল উপকার করিবার সামর্থ্য লাভের হেতু মাত্র। সুলভে বিদ্যাদান, ভাষার পরিণতি সাধন, কৌলীন্য প্রথায় কুঠারাঘাত করা, ইত্যাদি সমাজ হিতকর কার্য্যের, অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ব্যক্তিগত অভাব-মোচনেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। জীবনধারণোপযোগী নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ব্যতীত অন্য সামগ্রীর ভোগেচ্ছা তাঁহার ছিল না। অতএব তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের প্রায় সমস্তই সমাজের ও ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে ব্যয়িত হইয়াছে। হাওয়ার্ড নামে একজন পরম পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে পরের উপকার সাধনে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বাধা বিপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। লিস্‌বনের ভূমিকম্পের পর তথাকার লোকদিগকে সাহায্য করিতে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে তিনি ফরাসী কর্ত্তৃক শত্রু জ্ঞানে ধৃত হইয়া, ফরাসী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কারাজীবনের যন্ত্রণা নিজে ভোগ করিয়া, তিনি পরে কেবল ইংলণ্ড নহে ইউরোপের অন্যান্য কারাগারবিধির সংস্কার করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জনহিতকর চেষ্টায়, জগতের দুঃখভার যে কতই অপনোদিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। পরোপকারীর প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে আশার নূতন প্রাণপ্রদ সঞ্চার হইতে থাকে—উপকৃতের আসন্ন বিপদ তিরোহিত হইয়া ম্লান মুখে আনন্দের হাসি দেখা দেয়, তাহার আঁধার জগতে বিমল হর্ষ জ্যোতিঃ

বিকীর্ণ থাকে। যদি পরোপকারে জগতের দুর্ণিবার দুর্গতি নাশ হয় এবং নিরানন্দের স্থানে আনন্দ অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দের সৃষ্ট রাজ্যে উহা যে পরম ধর্ম্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রত্যুপকার।

যথার্থ পরোপকারী, দয়া বা কারুণ্য, সহানুভূতি ও উপকার করিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পরোপকার সাধন করেন—প্রত্যুপকার পাইব এ আশা কখনই তাঁহাদের হৃদয়ের বলবতী প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রত্যুপকার কিন্তু উপকারীর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উপকারীর প্রত্যুপকার না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয় এবং অকৃতজ্ঞতা মহা পাপ। এই পাপের ভয়ে কাজ করা এক কথা এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা অন্য কথা। একটী শাসন-সম্ভূত অপরটী সদ্‌বৃত্তি-প্রণোদিত। অতএব প্রত্যুপকার হইতে পরোপকার অধিকতর প্রশংসনীয়।

একদা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। এবং বৃকোদর জননীর সহিত এক ব্রাহ্মণের নিকেতনে বসিয়া আছেন এমন সময় তাহার অন্তঃপুর মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনরোল ইহাদিগের কর্ণগোচর হইল। কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত-চিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং ভীমসেনকে কহিলেন, "বৎস! পাপমতি দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে আমরা এই ব্রাহ্মণ নিকেতনে নিরুদ্বেগে বসবাস করিতেছি; তন্নিমিত্ত এবং ব্রাহ্মণের স্নেহ সমাদরে প্রীত আছি বলিয়া, কি প্রকারে তাহার উপকার করিব ইহাই অনুক্ষণ চিন্তা করি। ব্রাহ্মণের পরোপকারের সহিত আমাদের

প্রত্যুপকার অবশ্য তুল্য মূল্য হইতে পারে না। অতএব তিনি যে প্রকার আমাদের উপকার করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক উপকার করিলে কতকটা সুখী হইতে পারা যায়। ব্রাহ্মণের নিশ্চিত বোধ হয় কোন মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকিবে এবং এক্ষণে তাহার অপনোদন করিতে পারিলে আমাদের মানব জন্ম সার্থক বলিয়া উপলব্ধি করা যাইতে পারে।” মাতার এই উৎসাহবর্দ্ধক বচনে বৃকোদর দুঃসাধ্য হইলেও তিনি সাধন করিবেন এইরূপ নিজ স্বভাবোচিত প্রতিজ্ঞা করিলে পর কুন্তী, ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ করতললগ্নগণ্ড হইয়া পত্নী দুহিতা ও পুত্রের সহিত বসিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণ করা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্য নহে। এই নগরের অতি নিকটে দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। ঐ দুরাত্মা আপনার আহারের জন্য এরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, যে দিন দিন পর্য্যায়ক্রমে এক জন মনুষ্য ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। রাক্ষস আসিয়া সেই সমস্ত বস্তু ও তৎসহ আনীত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া স্বকীয় উদর পূরণ করে। অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত এবং আমার এরূপ অর্থ নাই যে মনুষ্য ক্রয় করিয়া ও তৎসহ তণ্ডুল পাঠাইয়া সংসারের সকলে অব্যাহতি লাভ করিব। আমার একটি কন্যা ও একটি পুত্র, অতএব ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী আপনাদিগের হিতার্থ রাক্ষস সমীপে বলি লইয়া উপস্থিত হইব। আপনারা অতিথি, অতএব আমাদিগের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করা উচিত। একার্য্য দুঃসাধ্য না হইলে আপনাদিগের প্রত্যুপকার গ্রহণ করিতাম।

এ দিকে কুন্তী দুঃসাধ্য কার্য্য বলিয়াই অর্থাৎ অসম্ভব প্রত্যুপকার পরোপকারের সমতুল জানিয়া, অপিচ হিড়িম্বা বধকালীন ভীমসেনের বিক্র-

ক্ষণ পরাক্রম অবগত থাকায় এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রহ্মণকে বলিলেন "আপনার একমাত্র পুত্র, অথচ আমার পাঁচপুত্র আপনার একটী হত হইলে যে ক্ষতি হইবে আমার একটী হত হইলে সে ক্ষতি হইতে পারে না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের অন্য কথা না শুনিয়া তিনি আশ্রয় দাতার প্রত্যুপকার সম্বন্ধে ভীমসেনকে ডাকাইয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। এ দিকে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমস্তই অবগত হইলেন। তাঁহার কোন বাধা বিপত্তি ধীরপ্রজ্ঞা পরোপকার-ধর্ম্মানুরতা মাতার নিকট স্থিতিলাভ করিতে পারিল না। এবং যথা সময়ে বৃকোদর অন্নাদি লইয়া রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক তৎপ্রসাদার্থ আনীত অন্ন ধ্বংস করিলেন এবং উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রাক্ষসের সমস্ত সন্ধিস্থান ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে ভূমে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ জাতীয় দুঃসাধ্য প্রত্যুপকার ও পরোপকার একই কথা।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা মহতের একটী মহৎ গুণ। ধৈর্য্য দ্বারাই মানব দুঃসাধ্য কর্ম্মেরও সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ জগতে ধৈর্য্য ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যাহার প্রতিভা আছে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত অনেকে যাহা করিতে না পরে সে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। কিন্তু যাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই তাহা দ্বারা কোন কার্য্য আমূল ও শেষ পর্য্যন্ত সংসাধিত হইতে পারে না। শৃঙ্খলার মূলে ধৈর্য্য এবং শৃঙ্খলা বিরহিত প্রতিভার সাফল্যের প্রত্যাশা করা যায় না।

এ সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র। যখন বাধা বিপত্তি, দুঃখ শোক, রোগ ও উহার প্রতীকার চিন্তা, পদে পদে মানব মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন দুঃখ ত আছেই এবং তৎপরে সুখও অবশ্যম্ভাবী এরূপ বিবেচনা করিয়া, কয় জন বাধা বিপত্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে পারে? বিপদে না পড়িয়া এবং অন্ন ও সাংসারিক অন্যান্য চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া অনেকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে, নিজের কাজে এরূপ অবহেলা করে যে সামান্য একটুর জন্য অনেক কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো এক দিন কোন দর্শকের পূর্ব্ব পরিদর্শন কালাবধি একটি প্রতিমার কি করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলেন "আমি এই অংশটী পুনর্ব্বার স্পর্শ করিয়াছি, এই অংশের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছি, এই অঙ্গ ভাব কোমল করিয়া দিয়াছি, ঐ পেশীটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছি, এই ওষ্ঠে একটু ভাব দিয়াছি এবং উক্ত প্রত্যঙ্গে অধিকতর জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছি।" দর্শক বলিলেন এ সব সামান্য বিষয়, ভাস্কর—তদুত্তরে কহিলেন "হইতে পারে সামান্য, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াই সম্পূর্ণতা সাধিত হয়, এবং সম্পূর্ণতা সামান্য বিষয় নহে।" এই সম্পূর্ণতা সাধন করিতে ধৈর্য্যই প্রধান সহায়।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে কত ধনী যে বিপদকে ডাকিয়া আনেন, অথবা এরূপ কার্য্য করিয়া বসেন যে, তাহাতে ধন নাশ হয়, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। ইহার অভাবে কত পণ্ডিত যে মূর্খের ন্যায় হাস্যাস্পদ হয়েন, তাহা ভাবিলে মনে হয় যে, বিদ্যা শিক্ষার সহিত ধৈর্য্য শিক্ষা না হইলে কোন কার্য্যেই সফলকাম হওয়া যায় না। যাহার বিপদে ধৈর্য্য নাই তাহার বিপদের উপর বিপদ বুঝিতে হইবে।

জগতে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা বাধা, বিপত্তি ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়ার সময়ে পড়িতে পারেন নাই, ক্ষুধার সময় আহার পান নাই, মনোমত নিশ্চিত গ্রাসাচ্ছাদনের সামগ্রী বা পদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, যাহাদের মুখের গ্রাস হয়ত অপরে লইয়া গিয়াছে এবং যাহারা পদেপদে অভাবনীয় শোক তাপের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কখন ধৈর্য্যচ্যুত বা চঞ্চল বা পশ্চাদপদ হয়েন নাই। তাঁহারাই প্রকৃতির প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঝটিকান্তের পর নিস্তব্ধতা হয়, সংগ্রামের পর শান্তি হয়, বিপদের পর সম্পদ হয়, এবং দুঃখের পর সুখ হয়। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ এক দিনে বনস্পতি হয় নাই, অল্প বেতনের প্রতিভাবান ব্যক্তিও অল্প দিনের মধ্যে উন্নতপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, সুতানুটী গোবিন্দপুরের মত সামান্য পল্লীও এক দিনে রাজধানীতে পরিণত হয় নাই। এই নিমিত্তই বিপদে পতিত হইলেও তাঁহারা অপরের ন্যায় আত্মহারা না হইয়া স্থির চিত্তে ও সংযত মনে সেই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার পথ উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হয়েন। তাঁহারা বিপদে বিক্ষুব্ধ হইলেও অচল অটল হিমাদ্রীর মত অবিচলিত থাকেন। ফলতঃ তাঁহারা অবস্থার বশীভূত না হইয়া, অবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিতে সচেষ্ট হয়েন। এ নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই স্থির, গম্ভীর ও অবিচলিত। তাঁহারা মহামতি বার্কের মত বিশ্বাস করেন যে, "বিঘ্ন সিদ্ধির সাধনস্বরূপ। যে আমাদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আমাদের স্নায়ুতন্তুগুলিতে বলাধান করে, আমাদের কৌশল শাণিত করিয়া দেয়। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীই আমাদের সাহায্যকারী।" তাঁহারা কৃষিজীবীদের মত বিশ্বাস করেন, যে সময়ে বীজ বপন করিলে সময়েই শস্য লাভ করা যায়, যে দিন বীজ উপ্ত হয় তাহার পর দিনই ফল পাওয়া যায় না, এবং সারবান বৃক্ষ, বক ফুলের বা সজিনা গাছের মত শীঘ্র ফুল বা ফল দেয় না অথবা উহাদের মত

সামান্য ভার বহনে অক্ষম নহে। যে বৃক্ষ গুরু ভার সৌধছাদবহন করিবে, সে বৃক্ষ বহু দিন যাবৎ ধীর স্থিরভাবে প্রকৃতির ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সত্যানুরাগ।

কি সভ্য, কি অসভ্য মানবের যত প্রকার সদ্‌গুণ থাকিতে পারে তন্মধ্যে সত্যানুরাগই প্রধান। যাঁহারা সত্যানুরাগী, তাহারা সর্ব্বদা সত্য কথা বলেন, সাধু জনের প্রিয় হয়েন এবং সত্যবাদীকে সমাদর করেন। সত্যেরই উপর জগতের সকল মঙ্গল অধিষ্ঠিত; একথা অসভ্য কোল ও ভিলেরাও জানে, সেইজন্য তাহারা সত্যপ্রিয়। তাহাদের সেই অশিক্ষিত সমাজের সামান্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে সত্যের যেরূপ বিশিষ্ট গৌরব দেখা যায়, জগতের আধুনিক সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে সেরূপ সত্যের মর্য্যাদা লক্ষিত হয় না। তাহার কারণ সভ্যসমাজ জীবনসমস্যা হইতে নিশ্চিন্ত হইবার অভিপ্রায়ে যেরূপ নানা অলীক কল্পনা করিতে পারদর্শী, অসভ্য কোল ও ভিলদিগের সেরূপ পারদর্শিতা নাই। স্বার্থের অনুরোধে লোকে সত্য পরিহার করিয়া অসত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সত্যানুরাগী, তাঁহারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। রাশি রাশি ধন পাইলেও তাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না। ইংরাজিতে একটী কবিতা আছে "Speak the truth, and speak it ever, cost it what it will"। অসভ্য সাঁওতালগণ সত্যবাদী বলিয়া মহাত্মা ঈশরচন্দ্র তাহাদিগকে বড়ই ভাল বাসিতেন। সেইজন্য তিনি একদিন তাঁহার কোন বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন "সাঁওতালেরা অসভ্য হউক কিন্তু

তাহারা সরল ও সত্যবাদী বলিয়া আমি তাহাদিগের সহিত আলাপে বড়ই আনন্দ পাই। তাহারা গালি দিলেও আমার প্রীতি জন্মে।"* সাঁওতাল পরগণার আদালত এখনও তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন।

সদা সত্য কথা বলা এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা, এই উভয়ই সত্যানুরাগের অন্তর্গত। রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণপান্তি দস্যুগণের নিকটেও সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণপান্তি নৌকারোহণে কলিকাতা আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে জলদস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। দুর্বৃত্তেরা তাঁহার নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশায় তাঁহাকে ঘোরতর প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণপান্তির নিকট অর্থ না থাকাতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাহা প্রদান করিতে চাহিলেন এবং দস্যুরা তাঁহার কথায় ইতস্ততঃ করাতে তিনি তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া কহিলেন "তোমাদের ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে থানায় ধরাইয়া দিব না। আমার বাসায় যাইলে তোমাদিগকে টাকা দিয়া নিরাপদে বিদায় দিব।" দস্যুরা তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে তাঁহার বাস ভবনে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত টাকা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিল। কৃষ্ণপান্তির ভ্রাতা তাহাদিগকে ধরাইবা দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিলেও তিনি স্বীয় সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে তিলমাত্রও বিচলিত হইলেন না।*

কথিত আছে জর্জ্জ ওয়াসিংটন শৈশবে পিতার নিকট একখানি কুঠার পাইয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া, উহাদের বাগানের ছোট ছোট গাছ কাটিয়া, উহার ধার পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অনেক চেষ্টায় বহুদূর হইতে একটী চেরী বৃক্ষের কলম আনিয়া রোপণ

---

* সাহিত্য পাঠ।

করিয়াছিলেন এবং জর্জ্জ ঐ বৃক্ষের উপর কুঠারের ধার পরীক্ষা করিতে গিয়া বৃক্ষটীর প্রায় সমস্তই ছেদন করিলেন। পর দিন তাঁহার পিতা অতি যত্নে রোপিত বৃক্ষের এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এই সখের বৃক্ষটীর এই অবস্থা করিয়াছে?" তদুত্তরে কিছুক্ষণ পরে নিজ দোষ বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় ও অনুতাপে অভিভুত হইয়া জর্জ পিতাকে বলিলেন "বাবা আমি মিথ্যাকথার আশ্রয় লইব না, আমিই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি" পুত্রের এই সৎসাহস দেখিয়া তিনি আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন, এবং প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "জর্জ্জ আজ সহস্র চেরী বৃক্ষের অধিকারী হইলে আমার যে আনন্দ না হইত, তোমার এই অকপট সত্যবাদীতা ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া আমি ততোধিক আনন্দ উপভোগ করিলাম। কোন্ বালক না অন্যায় করে? কিন্তু কয়জনের তোমার মত ঐরূপ সত্য কথা ব্যক্ত করিতে সাহস হয়? ভগবান করুণ চিরদিন যেন সত্যের প্রতি তোমার এইরূপ অনুরাগ থাকে।"

সর্ব্বদা সত্য কথা বলা ভাল, কিন্তু সকল সময়ে সত্যপ্রতিজ্ঞা বা শপথ করা নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু সত্যবাদীর সৎসাহস ও বিনয় না থাকিলে তাহার সত্যানুরাগের মূল্য থাকে না। কারণ যে স্থলে আবশ্যক নাই সে স্থলে অপ্রিয় সত্য বলিলে পরের মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং যে স্থলে আবশ্যক ভীত হইয়া সে স্থলে সত্য গোপন করিলে সমাজের অকল্যান সাধিত হয়।

অধ্যবসায়।

অধ্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ বিশেষরূপে শেষ পর্য্যন্ত উত্তম করা। এ জগতে সকল বিষয়ে সকলের প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নহে। যাহার যে

বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে তাহার সেই বিষয়ে উদ্যোগ করা, ও ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত উহা সমাধান করা উচিত। কিন্তু ধৈর্য্যের অভাবে, অথবা একবার বিফলমনোরথ হইলে, ভগ্নোদ্যম হওয়ায় অনেকে সফলমনোরথ হইতে চেষ্টাবান হয়েন না। অনেকে আবার বিঘ্নের ভয়ে প্রবৃত্তি থাকিলেও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এ সংসারসমরাঙ্গনে বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্পাদন করিতে সমর্থ, বাস্তবিক তাহারাই মানব নামের যোগ্য।

আজি কালি যে সমস্ত সামগ্রী ভোগ করিয়া আমরা চরিতার্থ হই, ইহার কোনটীও বিনা অধ্যবসায়ে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয় নাই। এবং এই গুলি যখন প্রথম উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়, তখন কি পরিমাণ অধ্যবসায় উহাতে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? কি আদি মানবের ফল মূল খাওয়ার পর ধান্য গোধূম ভক্ষণ, কি সিদ্ধ ও দগ্ধ ব্যঞ্জন খাওয়ার পর মুখরোচক নানাবিধ ব্যঞ্জন ভক্ষণ, কি বল্কল পরিধানের পর ঊর্ণা ও বৃক্ষতন্তু হইতে বয়নকরা বস্ত্র পরিধান, এ সমস্তই যে অধ্যবসায় পরম্পরার ফল, ইহা কেনা বিশ্বাস করিবে? এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে কি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই? আমরা যখন আহার করি কিম্বা পরিধান করি, তখন আমরা অনুমান করি যে অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদন বা প্রস্তুত করা সামান্য কৃষক বা তন্তুবায়ের কর্ম্ম, ইহাতে বিষয় কিছুই নাই। আশ্চর্য্যের এমন কি আমরা যখন কলের প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করি, অথবা রেলে বা জাহাজে আরোহণ করিয়া অন্যত্র গমন করি, অথবা সৌদামিনী চালিত গাড়ী বা বায়ু পরিচালন অবলোকন করি, আমরা মনে করি অর্থ থাকিলেই বুঝি সমস্ত সম্ভবপর হয়। কিন্তু এইগুলি যখন উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তখন কি অর্থের ক্রয়কারিণী শক্তি এগুলির সম্ভোগ সাধনে আমাদিগকে সমর্থ করিতে

পারিত ? কখনই নহে। তখন এগুলি অধ্যবসায়ীর সম্পত্তি সামগ্রীর বিষয়ীভূত ছিল। অনেকে হয়ত বহু পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, অনেকে হয়ত আবার অমিততেজে ও অদম্য উৎসাহে অভিলষিত ফল লাভে অনন্যমনে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কার্য্যে পরিণত করিয়া অধ্যবসায়ের ফলভোগে আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শক্তি ও সামর্থ্যের অনুসারে সকলেরই উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু সকল সময়ে সকলের শক্তি ও সামর্থ্যের কিরূপ সীমা হওয়া উচিত তাহা বোধগম্য হয় না এবং অবস্থাভেদে যথাকালে অনেকের অনুরূপ শক্তি স্ফুরিত হইতে পায় না। মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের কোন প্রেসিডেণ্ট পূর্ব্বে সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে তিনি প্রেসিডেণ্টের নিমিত্ত একখানি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাসন বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার কোন সুহৃদ তাহাতে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "কাষ্ঠাসন নির্ম্মাণে তুমি যে রূপ যত্ন লইতেছ, তাহাতে মনে হইতেছে তুমি বুঝি নিজে উহাতে বসিবে"। বাস্তবিক পক্ষে সূত্রধরকে যখন এ কথা বলা হইয়াছিল, তখন তাহার বন্ধুর মনে ছিল না যে, যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তখন উহা নীচ কর্ম্ম হইলেও মনোনিবেশ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন করা উচিত। এই সামান্য বিষয়ে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বিত হইলে ক্রমে উচ্চ বিষয়েও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অভ্যাসগত হয়, এবং ইহারই ফলে স্বহস্তে প্রস্তুত কাষ্ঠাসনের উপর গারফিল্ড্ প্রেসিডেণ্ট রূপে বসিতে পারিয়াছিলেন। এই উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ফলে কতবার বিফল মনোরথ হইয়া, কখন কখন আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও বাতুল বলিয়া অনুমিত হইয়াও সার রিচার্ড আর্করাইট বস্ত্র বয়ন যন্ত্র এবং ফরাসি দেশবাসী বার্ণার্ড্ প্যালিসি কাচের বাসন সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন

করিয়া যে, কেবল দুই একটী নূতন শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ নহে, জগতের নিত্য প্রয়োজনীয় একটী সামগ্রীর ব্যবহার সুলভ-সাধ্য করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাস্তব সামগ্রীর উৎপাদন ও প্রস্তুতি বিষয়ে অধ্যবসায় নিয়োগের কথা বলিলাম। এই বার আমরা অবাস্তব “অমূল্য ধন,” যাহা চোরে লইতে পারে না, সে বিষয়ে কিছু লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বা শ্যামাচরণ সরকার বা রামকমল সেনের অধ্যবসায়ের কথা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহারা কমলার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে পান নাই, তাঁহারা পাঠের পূর্ব্বে বা পরে যে বিশ্রাম আবশ্যক তাহা ভোগ করিতে পান নাই এবং যে সময়ে যাহা তাঁহাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহাও তাঁহারা সেই সময়ে ভোগ করিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি দ্বারা জীবিত রহিয়াছেন, তাহার মূল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিহিত। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির অদ্ভুত অধ্যবসায়ের কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যাহার ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রথিতযশা হইয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত পাঠ সমাপন করিতে ন্যায়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় স্বীয় প্রতিভা বলে শেষে গুরুকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়া যে বিদ্যা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই বলে নবদ্বীপই ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

ইতর প্রাণীদের অধ্যবসায়ের কথাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য, কারণ সামান্য পিপীলিকার উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের কথা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু কথিত আছে যে, রবাট ব্রুস ,একটী ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বারম্বার পরাস্ত হইয়াও পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া স্বট-

লাণ্ডের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শত বাধা বিপত্তির মধ্যে বারম্বার পরাস্ত হইয়া হৃদয় যখন স্তিমিত হইয়া যায়, তখন ভগ্নমনোরথ হওয়ারই কথা বটে। কিন্তু যথার্থ অধ্যবসায়ী তাহাতে অবিচলিত হইবার নহেন। ক্রসের মত লোক ও যখন স্থির করিয়াছিলেন যে, শেষ বারে বুঝি নির্ব্বোধ উর্ণনাভ আর চেষ্টা করিবে না, তখন সামান্য অধ্যবসায়ীরও দুই একবার বিফল মনোরথে অবসন্ন ও পশ্চাৎপদ হইবার কথা। কিন্তু উর্ণনাভের উদাহরণে ক্রসের অনুসরণ দেখিয়া আমাদেরও এইরূপ দৃঢ়পণ করিতে হইবে যে, কোন বিষয় অসাধ্য না হইয়া যদি দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত উপায়ে বার বার যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত এবং উপর্য্যুপরি কয়েক বার সেই চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হইলেও নিরুৎসাহ না হইয়া শত শত বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" রূপ দৃঢ় পণ করিয়া, ধীর পদে ও অদম্য উৎসাহের সহিত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

একাগ্রতা ও অভিনিবেশ।

কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে অভিলাষ ও আসক্তি এবং পরে যেমন উদ্যোগ ও অধ্যবসায় আবশ্যক, সেইরূপ একাগ্রতা ও অভিনিবেশ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সিদ্ধির চেষ্টাকে উদ্যোগ বলে এবং উদ্যোগের প্রধান অঙ্গ একাগ্রতা ও অভিনিবেশ না থাকিলে সিদ্ধিলাভের শক্তি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সাধ্য বিষয়ে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট বা অভিনিবিষ্ট হওয়ার নাম অভিনিবেশ। সেই কারণে অভিনিবেশ না হইলে যেরূপ ছাত্রের প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না, সেইরূপ অধ্যাপনায় অভিনিবেশ না হইলে গুরুও বিশিষ্টরূপে শিক্ষা দান করিতে পারেন না। যেমন সন্ধান অব্যর্থ না হইলে সুতীক্ষ্ণ শরও বিফল হইয়া যায়, তেমনই একা-

গ্রতা ও অভিনিবেশ না থাকিলে অতি কঠোর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ও নিষ্ফল হইয়া থাকে। এই কারণে একাগ্রতাও অভিনিবেশ অনিবার্য্য ও আবশ্যক। একাগ্রতা ও অভিনিবেশের আধিক্যানুসারে সম্পাদ্য বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারা যায়। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ে তন্ময়তা না জন্মিলে এবং অন্য বিষয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে সিদ্ধিলাভ করতলগত হয় না। এই নিমিত্ত আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইতে বাল্যাবধি তাহার চেষ্টা ও অনুষ্ঠান করা উচিত। যিনি এরূপ চেষ্টা করেন নাই, তাহার চিত্তের অভিনিবিষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, যেহেতু নিরন্তর অভ্যাসেই মনের অভিনিবেশ শিক্ষা হইয়া থাকে।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্র-চালনার সম্বন্ধে গুরু ছিলেন। কোন দিন নিজ শিষ্যগণের অস্ত্র শিক্ষা হইয়াছে কিনা, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি, কুরু ও পাণ্ডব বালকগণকে লইয়া একটি বিজন স্থানে উপস্থিত হইলে পর, তথাকার একটি বৃক্ষোপরি একটি কৃত্রিম পক্ষী রাখিয়া সকলকে একে একে ডাকিয়া বলিলেন "বৃক্ষস্থিত পক্ষীর একটি চক্ষু ভেদ করিতে হইবে, এক্ষণে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ বল?"

আগত শিষ্যবৃন্দের মধ্যে পর্য্যায় ক্রমে যেমন প্রত্যেকে আচার্য্যের নিকটস্থিত হইলেন, অমনি তিনি তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি দেখিতেছ"? অর্জ্জুনের অসাধারণ অভিনিবেশ শক্তি ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি যখন কোন বস্তুকে লক্ষ করিতেন, তখন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেন। এই কারণেই অর্জ্জুন ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেই প্রায় একরূপই প্রত্যুত্তর করিলেন। যুধিষ্ঠির পক্ষীর সহিত ভ্রাতাদিগকে, প্রান্তরকে, শাখা প্রশাখা সমেত বৃক্ষকে, দেখিতে পাইতেছেন, কহিলেন। এ কারণে দ্রোণাচার্য্য বিরক্ত হইয়া তাহাকে অপসৃত হইতে বলিলেন এবং পরে

দুর্য্যোধন ভীম ইত্যাদি কুরু ও পাণ্ডব বালকগণকে একে একে জিজ্ঞাসা করায় যুধিষ্ঠিরের মত সকলেই একই উত্তর দিলেন, অবশেষে অর্জ্জুন তন্ময় চিত্তে বলিলেন "গুরুদেব আমি একটি রক্তবর্ণ চক্ষু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" দ্রোণাচার্য্য সুপ্রসন্ন মনে আদেশ করিলেন, "তুমি এখনই এই চক্ষু ভেদ কর।" গুরুর আদেশ শ্রবণ করিবামাত্র অর্জ্জুন স্বীয় হস্তস্থিত শর নিক্ষেপ করিয়া পক্ষীর চক্ষুভেদ করিলেন। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রগাঢ় তন্ময়ত্ব জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর স্থলে সেই যোজন দূরস্থিত অতি দুরূহ লক্ষ্য বেধ করিয়া পাঞ্চালীকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বুনো রামনাথ শাস্ত্রালোচনায় সময়ে সময়ে এত নিবিষ্টচিত্ত হইতেন যে, নিজের আহার্য্যের বিষয় একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার সাংসারিক অতীব অসচ্ছলতা ছিল। সময়ে সময়ে আহার্য্যের দারুণ কষ্ট হইলেও শাস্ত্রানুশীলনে তিনি সর্ব্বদাই পরম আনন্দে থাকিতেন। একদা তিনি ন্যায়শাস্ত্রের কোন একটা কূট তর্কের চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় চতুষ্পাঠীতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী আসিয়া বলিলেন, "আজ ঘরে চাউল নাই।" রামনাথ একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরক্ষণেই এদিক ওদিক চাহিয়া আপন মনে টোলে চলিয়া গেলেন। যথাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া তিনি আহারে বসিলেন। তদীয় পত্নী কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে কিছু তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া অন্ন এবং আপনাদের গৃহপার্শ্বস্থ তিন্তিড় বৃক্ষ হইতে কতকগুলি পত্র লইয়া প্রচুর পরিমাণে সূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রামনাথ সেই বিচিত্র ব্যঞ্জনের স্বাদে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ ব্যঞ্জন কোথায় পাইলে, ইহা যে অমৃত।" ব্রাহ্মণী হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "আজ প্রাতে

অন্নের কথা জিজ্ঞাসা করাতে আপনি এদিক ওদিক করিয়া আমাদের ঐ তেঁতুল গাছের দিকে চাহিলেন। তাহাতেই আমি দুটী চাউল যোগাড় করিয়া তেঁতুল পাতার ঝোল রান্ধিয়াছি।" ব্রাহ্মণের আনন্দ যেন শত গুণে বৃদ্ধি পাইল, তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "যাহার বাটীতে এমন অমৃত বৃক্ষ, তাহার আবার কিসের অভাব? তুমি প্রত্যহই আমাকে এই তেতুল পাতার ঝোল রান্ধিয়া দিও।"*

অভিনিবেশ ও একাগ্রতা হইতে তন্ময়ত্ব, এবং তন্ময়ত্ব হইতেই প্রকৃত যোগ উদ্ভূত হয়। যোগে নানা অদ্ভুত শক্তির পরিস্ফুরণ হইতে দেখা যায়। যোগবলে পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন।

পুরাণে ধ্রুবের একাগ্রতা অসামান্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, পঞ্চম বর্ষ বয়সে একদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তথায় বসিবার ইচ্ছা করেন। রাজা তাহাকে ক্রোড়ে লইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় ধ্রুবের বিমাতা সুরুচি ঘৃণার সহিত ধ্রুবকে বলিলেন "আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ না করিয়া অকারণ কেন তুমি রাজপুত্রোচিত অভিলাষ করিতেছ? তুমি জান না যে তুমি সুনীতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ?" বিমাতার এই হৃদয়হীন বাক্যে ব্যথিত হইয়া ধ্রুব নিতান্ত বিষণ্ণ মুখে নিজ মাতার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে সুনীতি বলিলেন, "বৎস রাজার পুত্র হইলেও সুরুচির অবশ্য একথা বলিবার অধিকার আছে, কারণ তিনি মহারাজের প্রিয় পাত্রী। অতএব সেই ভক্তবৎসল অনাথের নাথ শ্রীহরির করুণ কটাক্ষ লাভ ব্যতিরেকে তোমার এ দুঃখ অপসৃত হইবার নহে।" মাতার এই মর্ম্মস্পর্শী

---

* সাহিত্য পাঠ।

কথায় শিশু ধ্রুব শ্রীহরির সাক্ষাত লাভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সেই কারণে মাতাকে কোনদিন নিদ্রিতা দেখিয়া ধ্রুব রজনীযোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কোন এক বনে একাগ্রচিত্তে হরিকে আহ্বান করিতে করিতে নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যমুনাতীরে মধুবনে কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। শ্রীভগবান তাঁহার একাগ্রতায় ও কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া যে বর দান করিলেন, তাহাতে ধ্রুব কৃতার্থ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার পিতা উত্তানপাদও সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকেই রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। এরূপ একাগ্রতা না থাকিলে ধ্রুব কি ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারিতেন?

এই যে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, তাড়িত শকট, তাড়িত আলোক, তাড়িত সংবাদ, তাড়িত ব্যজন, তারবর্জ্জিত তড়িদ্বার্ত্তা প্রভৃতি অতি বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিতেছে, ইহা পাশ্চাত্য মহাপুরুষগণের অপূর্ব্ব যোগসাধনার অমৃতময় ফল। সিসিলি দ্বীপের অন্তঃপাতী সিরাকিউস্ নগরে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্কিমিদিস্ নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি অঙ্ক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অত্যদ্ভুত অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। জলের ও অন্যান্য তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব তৎকর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। রোমীয়গণ যুদ্ধপোত লইয়া সিরাকিউস্ নগর আক্রমণ করিলে আর্কিমিদিস্ কতকগুলি বিশালদর্পণে সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া তদ্দ্বারা শত্রুকুলের অর্ণবযানগুলি দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সম্প্রাপ্তবিষয়ে অর্কিমিদিসের এমনই গভীর অভিনিবেশ ছিল যে, তিনি তৎকালে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। একদা স্নান করিতে করিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিমগ্ন হইলে শরীরভারের অনুরূপ জলরাশি স্থানচ্যুত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের এই একটী গুরুতম তত্ত্বের

মীমাংসা করিবার সময় তিনি এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, "ইউরেকা ইউরেকা" অর্থাৎ "বাহির করিয়াছি, বাহির করিয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগ্নদেহেই স্নানাগার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একদিন রোমীয় সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিরাকিউস নগর অধিকার করিয়া লইল। যৎকালে এই ভয়াবহ বিপ্লব সংঘটিত হয়, আর্কিমিদিস্ তৎকালে একটী জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই। অবশেষে কয়েকটী রোমীয় সৈন্য তদীয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে যোগিবর আর্কিমিদিস্ সমস্তই জানিতে পারিলেন। দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ না জানিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। তাহাদের ঐহিক জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হইল বটে কিন্তু জগতের প্রতিভারবি অকালে অস্তমিত হইলেন।*

কি আশ্চর্য্য ধ্রুবের ঐশ একাগ্রতায় হিংস্রক জন্তুও বাধা দিল না, কিন্তু মানুষে তাহা সহ্য করিতে পারে না। অধিক সংখ্যক মানব একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চিত্তের একাগ্রতা সমাধানে সিদ্ধ তাঁহারাই ধন্য।

স্বদেশ ভক্তি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", জননী ও জন্মভূমি যে স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা সকল ভাষায় সকল দেশের স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কেবল যে স্বীকার করিয়াছেন এরূপ নহে, সকলেই অনুভব করিয়াছেন।

---

* সাহিত্য পাঠ।

এই নিমিত্ত যেরূপ নিজের মাতার সহিত অপরের মাতার রূপ বা গুণের তুলনা করিতে অভিলাষ হয় না, সেইরূপ নিজ দেশের সহিত অন্য দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার দেশ যদি স্বভাব সৌন্দর্য্যে হীন হয়, আমার দেশে যদি উত্তুঙ্গ যোগনিমগ্নবৎ অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ না থাকে এবং উহা অনুদ্ঘাতিনী সমতল ভূমি হয়, তাহা হইলেও আমার দেশ বলিয়া সকলই সুন্দর। আমার দেশ সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা হইলেও আমার কাছে যেরূপ প্রিয় হইবে, উহা শালভূমি সমূহের কর্কশ বন্ধুর দৃশ্যযুক্ত হইলেও আমার কাছে তদ্রূপ প্রিয় হইবে। আমার দেশ, ফল, ফুল, ঘৃত, দুগ্ধ, ধনধান্যে পরিপূর্ণা সুজলা সমতুল ভূমি হইলেও আমার কাছে যেরূপ প্রিয়, উহা প্রস্তরময়, বন্যাসমাকুল, তৃণ গুল্মের সামান্য আবরণে সমাচ্ছন্ন উদগ্র শৃঙ্গাবলীতে সীমান্বিত হইলেও আমার কাছে সেইরূপ প্রিয়। এই নিমিত্তই Sir Walter Scott লিখিয়া গিয়াছেন—

O’ Caledonia ! Stern and wild,
Meet nurse for a poetic child !
Land of brown heath and shaggy wood,
Land of the mountain and the flood,
Land of my sires ! what mortal hand
Can ever untie the filial band
That knits me to thy rugged strand !

এই নিমিত্ত এ দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে করিতে যখন মাতৃভূমির কথা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়, তখন অবসর গ্রহণ করিয়া ইয়ুরোপ বাসীরা স্বদেশে গমন করেন। এই নিমিত্তই প্রবাসে থাকিয়া মধ্যে

মধ্যে স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং নিজদেশে প্রত্যাগত হইয়া মনে হয়—

"কত কত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত কত নগর শোভন,
কিন্তু তাহাদের এই সুষমা নিচয়,
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।"

এই নিমিত্ত জন্মভূমি পরম পবিত্র তীর্থ স্থান ও স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্তই বোধ হয় সংসার-ত্যাগী উদাসী বিরাগীকেও জন্মভূমি দর্শন না করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। অতএব এই স্বাভাবিক স্বপ্রণোদিত স্বদেশানুরাগ যাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য মানব অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির হইবে। এই পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ মানবের মধ্যে তাহার প্রতি কাহারও সহানুভূতি দৃষ্ট হইতে পারে না। যখন অন্যান্য মানবে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্যস্ত, তখন সে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে উদাসীন। জন্মভূমির কোন হিত কার্য্যই তাহার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, জন্মভূমির দুর্দ্দশা দেখিলে তাহার হৃদয় ভীষণ দাবদাহে জর্জ্জরিত হয় না, এবং জন্মভূমির সুখ সমৃদ্ধিতে তাহার হৃদয় নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইতে পারে না। এই জাতীয় লোকের বিষয়ে Sir Walter Scott লিখিয়া গিয়াছেন—

If such there breathe, go, mark him will,
For him no Minstrel raptures swell,
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can claim,
Despite those titles, power, and pelf,
The wretch, concentred all in self,

Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
To the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonoured and unsung

বাস্তবিক পক্ষে যে দেশে আমাদের পিতা,পিতামহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যেস্থানে তাঁহারা কত মহৎ সঙ্কল্পের অনুষ্ঠান করিয়া পরবর্ত্তী পুরুষের দ্বারা উহা সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশান্বিত হইয়া ছিলেন,—যেস্থানে সন্তান সন্ততি বংশপরম্পরাগত উপার্জ্জিত বাস্তব ও অবাস্তব ধন সম্পত্তি ধারাবাহিক পর্য্যায়ক্রমে ভোগ দখল করিবে,—এই কল্পনা সুখে পিতা পিতামহ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া লব্ধ ধনের ব্যয় সংযম করিয়া গিয়াছেন—সেস্থানে তাঁহাদের বংশধরদের দ্বারা যদি পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম অসম্পাদিত থাকে, নূতন সংকল্প যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ইত্যাদির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এগুলির অনুষ্ঠানে চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা নিজ বংশের পরিচয় দিতে কিরূপে সাহসী হইতে পারেন? জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যে রূপ সকলের পক্ষে আবশ্যক সেইরূপ সময়ে সময় সমবেত হইয়া অথবা সমভাবাপন্ন হইয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টা করাও আবশ্যক। যাহাতে কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে কুসংস্কার অপনোদিত হয়, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়, এবং যাহাতে দেশের ইতর ভদ্র সকলের অথবা তাহাদের অনেকের উপকার হয়, স্বদেশানুরাগ না থাকিলে সে বিষয়ে কিছুই করা যাইতে পারে না।

সাধুতাই প্রশস্ত উপায়।

এ জগতে যদি সকলেই সাধু হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে গৃহে কপাট দিতে হইত না, ঐহিক সম্পত্তি ভোগে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইত না, সামগ্রী ক্রয় করিতে বঞ্চিত হইতে হইত না, এবং মধ্যে মধ্যে অকারণ সন্দিগ্ধ না হইয়া সংসারে স্বর্গসুখ অনুভব করা যাইত। এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া সুখী হইতে, জগতের এক এক ব্যক্তি যে সকল পন্থার অনুসরণ করেন, তাহারই ফলে এ সংসারের সুখ ও দুঃখ হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি লোক আছে যাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে বা ব্যবহারে তাঁহারা নিজেও সুখী হয়েন ও অপরকেও সুখী করেন, কিন্তু এরূপ লোকও আছে যাহারা অদূরদর্শিতা হেতু পরকে কষ্ট দিয়া, অথবা তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া, ক্ষণকালের নিমিত্ত মনে মনে সুখানুভব করে। এই ক্ষণিক আপাতমনোহর সুখ লাভ করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

সাধু ব্যক্তির সুখ সাধুতায় এবং অসাধু ব্যক্তির সুখ অসাধুতায়। অতএব সুখের উৎপত্তিস্থল আমাদের মনে। মন যখন বিমল থাকে তখন সাধু কর্ম্মের সুখ ও অসাধু কর্ম্মের দুঃখ উপলব্ধি করা যায়, এবং মন যখন বিকৃত ও কলুষিত হয় তখন অসাধু কর্ম্ম করিয়াও মনে মনে সুখানুভব করা যায়। প্রতিপালন পদ্ধতি, ও সাধুজনোচিত ব্যবহারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণের উপর মানব মনের সাধুতা অনেকটা নির্ভর করে। অতএব বাল্যকাল হইতে, কি গৃহে ভ্রাতা ভগিনী, মাতা পিতা, বা অন্যান্য গুরুজনের সহিত, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বা অপরাপর ছাত্রদের সহিত, কি সমাজে অন্যের সহিত, ভাব বিনিময়ে, বা আলাপে, বা ব্যবহারে, সাধুতার অনুশীলন করিতে হইবে। এই কারণে সামগ্রীর অধিকারী, না বলিয়া লইলে বিরক্ত

হইবেন না, অথবা গ্রাহ্য করিবেন না, কিম্বা তিনি অপহরণ বিষয়ে জানিতে পারিবেন না, কিম্বা তাহার ক্ষতি হইলেও উহা এত অল্প যে উহা তিনি বোধ করিবেন না, এ সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া উচিত নহে। সেই নিমিত্ত চাহিলেই পাইব বা পাইয়া থাকি বলিয়া মাতাপিতা, বা ভ্রাতা ভগ্নীর সামগ্রীও, তাহাদের বিনা অনুমতিতে লওয়া উচিত নহে। আর এক জাতীয় অসাধুতা, যাহা বালকদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, এবং যাহা দূষণীয় বলিয়া তাহারা অনুমান করে না, সে দোষও পরিহার করা নিতান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে যে বালক নিজে যে অঙ্কটীর সমাধান করে সেটী তাহার সম্পত্তি, কিন্তু সেটী অন্য কেহ নকল করিয়া নিজের বলিয়া শিক্ষকের নিকট জ্ঞাপন করিলে, তাহার পরের ধন অপহরণ করা হয়। অবশ্য বাস্তব ধন অপহরণ করিলে যেরূপ অধিকারীর ক্ষতি হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অপহরণে সেরূপ ক্ষতি হয় না বটে, কারণ বিদ্যা অমূল্য ধন উহা চোরে লইতে পারে না, কিন্তু পরের সামগ্রী আপনার বলায়, মিথ্যা কথা বলা হয় ও মানসিক প্রবৃত্তিচয়কে নীচ করা হয়। সমাজেও সেইরূপ অসাধুতার পরিচয় দিলে সন্দেহের পাত্র হইতে হয়। অতএব আগাগোড়া সাধু হইতে হইবে এবং মনে মনে সাধুভাব অনুভব করিতে হইবে। এ জগতে অনেকে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার আবশ্যক হইলে, সাধুতার ভাণ করেন, এবং স্বার্থের নিমিত্ত অসাধু ভাব পোষণ করিতে কাতর হন না, কিন্তু যে ব্যক্তি যথার্থ সাধু, তিনি একটী অসাধু কর্ম্ম করিলেও আর করিব না বলিয়া মনকে প্রবোধ না দিয়া, নিতান্তই অনুতপ্ত হয়েন, এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মনে মনে সুখানুভব করিতে পারেন না। বাল্যকাল হইতে পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্র জ্ঞান, পরের গৃহে অর্গল বদ্ধ দ্বার দেখিলে উহা যাহাদের ভয়ে বদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদিগকে ঘৃণা, যাহারা স্বার্থের

নিমিত্ত মিথ্যা কহে তাহাদিগকে নগণ্য জ্ঞান, করিতে করিতে, সাধু ব্যক্তিদের এমনই মনের ভাব হয় যে, যদি সামান্য ক্ষমা-যোগ্য অসাধু কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা হইলেও অনুতাপের ভীষণ দাবদাহে তাঁহারা জর্জ্জরীভূত হয়েন। তাহাদের বিবেকই তাঁহাদের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার কর্ত্তা। এই নিমিত্ত বাহ্য জগৎ দেখিতে না পাইলেও, নিজ বিবেকের নিকট তাঁহারা লজ্জায় অবনত হইতে প্রস্তুত নহেন। মহামুনি লিখিত, সুদূরে অবস্থিত, অগ্রজ শঙ্খমুনির, দর্শন লাভের ইচ্ছায় একদা যাত্রা করিলেন। পথে বেলা অধিক হওয়ায় লিখিত মুনি ক্ষুধা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন, এবং একটী আমগাছের ছাওয়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই গাছের নীচেকার ডালে একটি পাকা আম ঝুলিতে দেখিয়া, আহ্লাদের সহিত উহা পাড়িয়া উদরস্থ করিলেন। পরে ক্ষুধা তৃষ্ণার কতক পরিমাণ নিবৃত্তি হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বৃক্ষস্বামীর বিনা অনুমতিতে ফল গ্রহণ করায়, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়াছে। যদিও ফল অপহরণ কেহ দেখিতে পায় নাই, তথাপি মনের অগোচর পাপ থাকিতে পারে না। এ কারণে অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া, লিখিত মুনি, দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং শঙ্খ মুনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন, পাপ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অতএব আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না। এই বলিয়া তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কিরূপে পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়াছেন, তাহা জেষ্ঠ্যকে বলিলেন, তদুত্তরে জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, বৃক্ষটী তাঁহার, অতএব ভ্রাতার বৃক্ষের ফল না বলিয়া লওয়ায় যে অপরাধ হইয়াছে উহা ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু উভয়েই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শাস্ত্রানুসারে পরস্বাপহরণের প্রায়শ্চিত্ত রাজাচার। এ কারণে ক্ষণপরে লিখিত মুনি ধর্ম্মাধিকরণের অভিমুখে

গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে পর যখন তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি নিজ কর্ম্মের কথা জ্ঞাপন করিয়া, মহারাজকে বলিলেন যে, দণ্ডনীয় ব্যক্তি আসন পরিগ্রহের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং অপরাধের কথা জ্ঞাত হইয়াও রাজা যদি বিচার না করেন, তাহা হইলে রাজার পাপ হইতে পারে। তাঁহার কথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজা বলিলেন যে, ভ্রাতার বৃক্ষের ফল হরণ করা ক্ষমা-যোগ্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে আপনি দণ্ডনীয়, এবং যে হস্ত ফল অপহরণ করিয়াছে, উহার ছেদন করাই উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু আমার দ্বারা তাহা হইতে পারে না, ভগবন্, আমায় এ সমস্যা হইতে রক্ষা করুণ। এই কথা শুনিবামাত্র মহর্ষি, কিরাতের হস্ত হইতে অসি লইয়া, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং সভাসদ সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। অনবিলম্বে লিখিত, মনের জোরে এইবার গিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আলিঙ্গন করিলেন।

এ জগতে পূর্ব্বোক্ত সাধুতার উদাহরণ বিরল। ইহা মনের বিমলতার উৎকৃষ্ট বিবরণ। কিন্তু আমরা বড় হইয়া সংসারের যে সকল অসাধুতার বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, অসাধুতার ফলেই জগতে জীবনযাত্রা ঘোরতর জটিল হইয়া পড়িতেছে। অসাধুর অর্থলিপ্সায় কেবল যে, বঞ্চিত ব্যক্তির ক্ষতি হইতেছে এরূপ নহে, অনেক সময় তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হইতেছে, এবং অনেককেই কারণ না থাকিলেও, সন্দেহ করিতে হইতেছে। অনেক সময় অপরকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট জাল নোট বা টাকা লইয়া কোন প্রকারে বিচারালয় হইতে ত্রাণ পাইতে হয়। অপরে যখন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মিথ্যা রটাইয়া থাকে তখন মনঃকষ্ট ত আছেই, পদে পদে, আত্মীয়, পরিচিত ও উপরওয়ালার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যে

সময় ও অর্থনাশ হয়, তাহাতে ক্ষণকাল ব্যাপী মানব জীবনের অনেক সম্পাদ্য কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এইরূপে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা কত সময় যে কেবল মনঃকষ্ট হয় এরূপ নহে, শরীর ভঙ্গ ও হইয়া থাকে। নীচ ব্যবসায়ীরা যে কেবল ওজনে কম সামগ্রী দেয় এরূপ নহে, খাঁটী বলিয়া যখন তাহারা দুগ্ধে পানা পুকুরের জল, অথবা ঘৃতে অস্বাস্থ্যকর সামগ্রী অথবা তৈলে বিষাক্ত সামগ্রী মিশ্রণ করে, অথবা মসলায় বা ডাইলে আবর্জ্জনা মিশাইয়া ভারী করে, অথবা তাজা বলিয়া পচা সামগ্রী বিক্রয় করে, তখন যে কেবল গৃহস্থের অর্থ নাশ হয় এরূপ নহে, ঐ সকল সামগ্রী, ভক্ষণ অথবা পান করিয়া, ক্রেতাদের ইহলীলা সম্বরণের কাল সংক্ষেপ হয়। এই জাতীয় ব্যবসায়ীরা চোর নহে ইহারা দস্যুর সমান, কারণ চোরে গুপ্ত ভাবে অধিকারীর সামগ্রী লয়, ইহারা প্রকাশ্য ভাবে সরল বিশ্বাসীর সারল্যের সুযোগ লইয়া থাকে। এ জাতীয় অসাধুরা নিতান্ত অদূরদর্শী; কারণ তাহাদের অসাধুতার বিষয় অবিলম্বে জানিতে পারা যায়। ইহারা শ্রম করিতে নিতান্ত কাতর, সেই জন্য স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ইহারা অনায়াসে অপরের শ্রমলব্ধ সামগ্রী লইতে ইচ্ছা করে, অথচ ইহাদের বাসনা পরিতৃপ্তির ইচ্ছাও শ্রমশীল ব্যক্তির মত সম্পূর্ণ জাগ্রৎ। কিন্তু অল্পব্যবসায়ীদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাধু তাহার বাজারসম্ভ্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহার উন্নতি অনিবার্য্য। সামান্য কৃষকদের মধ্যে ও যে সাধুতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, যদি সকলে এরূপ হইত তাহা হইলে এ জগতে সকলেই সুখে দিনাতিপাত করিত। যে ব্যক্তিই ন্যায়পথ ছাড়িয়া চলিয়াছে তাহাকে কখন সুখী হইতে দেখা যায় নাই। সে ব্যক্তি হয় মনঃকষ্টে দিবারাত্র যাপন করিতেছে অথবা রাজদ্বারে উপস্থিত। এ জগতে সুখ অর্জ্জন করিতে আসিয়া কেবল অসাধু পথ অবলম্বন ও তাহারই ফলে দুঃখ ভোগ করা, কখনই শ্রেয়ঃ

হইতে পারে না। সৎপথে থাকিয়া শাকান্ন ভক্ষণ ও শ্রেয়ঃ, কিন্তু অসৎ পথে থাকিয়া গাড়ী ঘুড়ীতে আবশ্যক নাই। যাহাতে বিমল মনে আন্তরিক সুখ হয় তাহা সাধুতা সম্ভূত।

বিনয় ও সৌজন্য।

এসংসারে বিরক্তির কারণ পদে পদে উপস্থিত, যেহেতু সকল মনুষ্যেরই ভ্রমে পতিত হওয়া সম্ভব, এবং সেই ভ্রম হেতু অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হওয়াও সম্ভব। কিন্তু সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কি সকল সময় সেই ক্ষতি বোধ করিতেই হইবে? যাঁহারা স্বভাবতঃ শিষ্ট, ভব্য ও বিনয়ী তাঁহাদের মনে কিন্তু ক্রোধ বা অমর্ষের ভাব জাগরূক হইলেও উহা প্রকাশ পায় না। যদি বা প্রকাশ পায় উহা এরূপ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, ক্ষতিকারী তাহাতে বিরক্ত না হইয়া উপকৃত মনে করে। সেইরূপ আবার অপরাধ বা ভ্রম করিয়া স্বীকার করাও বিনয়ের লক্ষণ। অনেকে হয়ত একটী ভ্রম করিয়াছেন ও নিম্নতন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা প্রদর্শিত হইয়াছেন। এস্থলে ভ্রম স্বীকার করিতে অনেকে প্রস্তুত হন না। তাঁহাদের জ্ঞান মনুষ্য বুঝি ভ্রমে পতিত হইতে পারে না। ভ্রম হেতু যাহার ক্ষতি হইয়াছে তাহাকে তুষ্ট করা অনেক সময় সহজ, কারণ সে ব্যক্তি হয়ত উদারচেতা, কিন্তু ভ্রম স্বীকার করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। শেষোক্ত ব্যক্তিরা ভ্রম স্বীকার করাকে মনে করে নিজেকে ছোট হইতে হইবে। তাহারা ভুলিয়া যান যে "বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।" এই নিজেকে ছোট করিয়া বড় হওয়া ত পরের কথা, অপরকে ছোট করিয়া বড় হইবার প্রলোভন অনেকেই বিদ্যমান। এই লোভ

সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেকে পরের ছল গ্রহণ করিয়া থাকে। সভা সমিতিতে অথবা পাঁচ জনের সম্মুখে অপরকে অপ্রতিভ করিতে পারিলে মনে মনে বড়ই আনন্দ হয় ও পরকে নিম্নতম সীমায় আনীত করিয়া মনে মনে ‘বড় হইলাম’ বোধ হয়।

হৃদয়ে উদারতা, ভক্তি, অপরের মর্য্যাদা রক্ষণ, প্রীতি, ইত্যাদি গুণ না থাকিলে প্রকৃতরূপে বিনয়ী হওয়া যায় না। হৃদয়িক ব্যক্তি না হইলে অথবা বিদ্যার প্রভাব মনোমধ্যে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার না করিলে, বিনয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গুরুজন এবং প্রবীণ ও প্রবীণাদিগকে ভক্তি করায় ও তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষণে আন্তরিকতা প্রদর্শনে, সমান অবস্থার ব্যক্তির সহিত সমান ব্যবহারে, এবং নিম্ন অবস্থার ব্যক্তির যাহাতে মনে কষ্ট না হইয়া বরং সুখ বা আহ্লাদ হয় এরূপ আচরণে, বিনয়ের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে মনে কত কল্পিত বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। পল্লিগ্রামে পূর্ব্বে নীচ জাতির মধ্যে কত গ্রামসম্পর্কের দাদা ও খুড়া এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু বাল্যকালে তাহাদিগকে একবার ঐরূপ সম্ভাষণ করিয়া পরে অধিক উপার্জ্জন করিয়া, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া, এখন অনেকে তাহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করে। তাহাদের সর্ব্বদাই মনে হয় বুঝি তাহাদের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিলে নিজেকে ছোট হইতে হইবে। এই জাতীয় লোক ইংরাজী না জানা লোকের নিকট অথবা যে সংসারে সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষ পতিত হয় নাই, ইংরাজী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াই, তথায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার চাল চলনে, আবৃত্তির ধরণ ধারণে, গ্রামের লোকের তিষ্ঠান ভার হয়। তাহারা একবারও ভাবে না যে সংস্কৃত ভাষায় বা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে যাহারা জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছে, আজ তাহাদের

অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা মর্য্যাদা লাভের কোন গুণে বঞ্চিত নহেন। যাহারা বিষয় কর্ম্মে গ্রামের মধ্যে একজন বিচক্ষ লোক বলিয়া পরিগণিত, অথবা যে ব্যবসায়ী নিজ সাধুতা ও ব্যবসায় বুদ্ধির প্রভাবে আজ রাজার সম্ভ্রম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথচ ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহারা কি ভক্তির যোগ্য নহেন? এবং তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষণ করিলে অথবা তাহাদের প্রতি বিনীত ব্যবহার করিলে কি কল্পিত গৌরবের হ্রাস হইবে? পণ্ডিতকে সম্মাননা করিলে বিদ্যার সম্মাননা করা হয় এবং নীচকে প্রিয় সম্ভাষণ করিলে তাহাকে উচ্চের সম্বর্দ্ধনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

যাহারা অল্পশিক্ষা লাভ করিয়া অথবা অল্পগুণের আধার হইয়া জগতকে শরাব খণ্ড মনে করে, তাহাদের স্মরণ করা উচিত যে, স্বীয় প্রসিদ্ধ জীবনের অবসান কালে মহামতি নিউটনের মত লোকও বলিয়াছিলেন "জগৎ আমাকে কি ভাবে দেখিবে তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিজে নিজে বিবেচনা করিতেছি যে, আমি এখনও একটী বালকের ন্যায় সাগর কূলে খেলা করিতেছি। সাধারণ অপেক্ষা কখনও অধিকতর উজ্জল উপলখণ্ড বা অধিকতর মসৃণ শুক্তি দেখিতে পাইতেছি। ওদিকে সত্যের মহাসমুদ্র অনাবিস্কৃত অবস্থায় আমার সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে।"

জগদীশ্বর যেরূপ সকল ব্যক্তিকে সমভাবে সূর্য্যরশ্মি ও বৃষ্টিদান করেন সেরূপ কিন্তু সমভাবে সকলকে ধনের বা সম্পদের অধিকারী হইতে দেন না। এই জন্যই এ জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক পরিদৃষ্ট হয় এবং এই অবস্থার বিভিন্নতাই বোধহয় মানব মাত্রকে বিনয়ের ও সৌজন্যের আবশ্যকতা অনুভব করিতে দেয়। স্বীকার করি মানব নিজ চেষ্টায় উন্নীত হয়, কিন্তু একপ্রকার চেষ্টা করিয়া, এক প্রকার উপাধি লাভ করিয়া ত সকলে একপ্রকার ধনসম্পদ বা মানের অধিকারী হবেন না,

অতএব উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি কেহ অধিক সম্পদের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে তাহার কি নিজের মত পরিশ্রমী অথচ অল্প ধনশালী ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা উচিত। তাহার সহিত বিনীত ব্যবহার করিয়া সমবেদনা প্রদর্শন করা বিনয়ের লক্ষণ। কিন্তু জগতে উচ্চ, মধ্যম, ও নীচ সকল শ্রেণীর লোকই চিরকাল বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। এবং সেই কারণে যদি স্বার্থই বিনয়ের মূলীভূত কারণ হয়, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীর লোকের নিকট নীচ শ্রেণীর লোক কখনই বিনয় প্রত্যাশা করিতে পাইবে না। রাজরাজেশ্বর, যাহার কখন অন্যের সাহায্য লইবার আবশ্যক হয় না, তিনি যাহাতে বিনয় ও সৌজন্য গুণে বঞ্চিত না হয়েন এ কারণে নহুষ ইত্যাদি রাজার বিড়ম্বনা কথা পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে।

যাহারা অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে নানাবিধ দুর্বিনীত ব্যক্তির সংঘর্ষে আসিয়া জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিনয় গুণে অলঙ্কৃত, কারণ অবিনয়ীর ব্যবহারে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছেন তাহা মনে করিয়া তাহারা আর নিজে অবিনয়ী হইতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু ধনবানের পুত্র যাহারা, শ্রমের বিনিময়ে ধনলাভ করা হইয়াছিল, এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের অনেকে, যাহার নিকট প্রত্যুপকার পাইবার আশা নাই, তাহাকে বিনয় সম্ভাষণ করিতে কাতর। তাহাদের জ্ঞান যে তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিকট বিনীত হইলে বুঝি ধনীর মর্য্যাদা হ্রাস হয়। বাস্তবিক এজাতীয় লোকের আত্মমর্য্যাদার এমনই ভুল বিশ্বাস যে, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোকের নিকট তাহারা চাটুকারের মত আলাপ করিতেও প্রস্তুত। তাহাদের জানা উচিত যে, বড়লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করা দৈবায়ত্ত, কিন্তু গুণবান হওয়া নিজায়ত্ত। যাহা দৈবায়ত্ত তাহার বলে

বলীয়ান হইয়া, স্পর্দ্ধার সহিত কিঞ্চিৎ অল্পধনের অধিকারীকে অবিনয় ও অভদ্রতা প্রকাশ করা কুশিক্ষার ফল বুঝিতে হইবে। এ জাতীয় লোকের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু তাহারা সুশিক্ষা লাভ করে নাই বলিয়া দুঃখিত হইতে হয়।

বিনয় একটী বিশেষ গুণ এবং ইহার মূলে স্বার্থ নাই। ইহা রাজার পক্ষে যেরূপ ধনীর পক্ষে এবং মধ্যবিত্ত ও দারিদ্রের পক্ষেও সেইরূপ অত্যাবশ্যক। ইহারই অভাবে প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সিরাজদ্দৌলার বিপক্ষতা করিয়াছিল এবং ইহারই গুণে অগষ্টস্ সিজরের নিকট তাহার প্রজাবৃন্দ সর্ব্বদাই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকিত। ইহারই অভাবে সংসারে মনঃকষ্ট ও পরে গৃহবিচ্ছেদ, এবং ইহারই গুণে পরিবার মধ্যে সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তি। ইহারই অভাবে ব্যবসায়ীর ব্যবসাগার জনহীন, এবং ইহারই গুণে মোকামগুলি ক্রেতা ও ব্যাপারীতে পরিপূর্ণ *। ইহারই গুণে সামাজিক জীব হইয়া কোন মনুষ্য সকলের প্রিয় এবং কেহবা দূর হইতে পরিত্যক্ত।

রাজভক্তি ও রাজস্ব প্রদানের সার্থকতা।

জগতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে এখনও শাসনের সার্থকতা অনুভূত হয় নাই। আবার এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রাজত্ব স্থাপিত হইয়া থাকিলেও প্রজার মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্ধারণে রাজার দায়িত্ব জন্মায় নাই। এই সকল দেশে জীবন ও সম্পত্তির মঙ্গল নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্পত্তি সংরক্ষণে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। রাজ্য

---

* Civility pays in business.

হইতে যে সাহায্য পাইবে এ আশা তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা গুণে যে, দস্যু তস্কর তাহাদিগের পরিশ্রমলব্ধ ধন সামগ্রী অপহরণ করিতে অসমর্থ, ইহা তাহাদের ধারণার বহির্ভূত। এজাতীয় রাজত্ব বর্ব্বর দেশের শোভা বর্দ্ধন করে। এরাজত্বে "এখন পরিশ্রম করি ভবিষ্যতে ধনলাভ হইবে, এবং প্রাপ্ত ধনের ব্যবহার ও হস্তান্তর স্বত্ব আমাতেই থাকিবে" এভাব কখনই মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে না। উৎপন্ন সামগ্রীর ফলভোগে যে দেশে নিশ্চিততা নাই সে দেশে প্রস্তুত সামগ্রীর সমাবেশ কি সম্ভবপর? সে দেশের ধন সামগ্রী যাতায়াতের রেল খাল রাস্তারও ত বিস্তার হইতে পারে না। যদি বা হয় ত সার্থবাহ কি তাহাতে চলাচল করে? যদি বা তাহারা দূরদেশ হইতে নিজ লোক বলে আসিতে পারে তাহা হইলেও কি দোকান পাট চলে? যদি দোকান পাট না থাকে তাহা হইলে বিকি কিনি কোথায়। যদি তাহাই অসম্ভব তাহা হইলে সে রাজত্বে বাস করা ও বন্য পশুর মধ্যে একত্র বাস করা ও সমান কথা।

এই সকল অসুবিধা দূর করিতে স্থায়ী ও সমীচীন বিধিব্যবস্থার আবশ্যক। ইহারই কল্যাণে প্রজাগণের স্বত্ব সংরক্ষিত হইয়া থাকে। এই মঙ্গল সাধন করিতে সৈন্য ও রণতরী রাখিতে হয়, নচেৎ বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ভয়, কিংবা রাষ্ট্র বিপ্লব ভয়, প্রজাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকিলে স্বস্তি থাকে না—দেশের উন্নতি সাধিত হয় না। উদ্যমশীলের উদ্যম কর্ম্মফল হইবে না বলিয়া, তাহারা দুদিনের জন্য শ্রম সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়—নবনবোন্মেষিনী মানসিক শক্তির বিকাশ দেখাইতে প্রতিভাবানেরা ভিন্ন দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়।

শাসন ব্যবস্থার গুণে গ্রামে গ্রামে প্রহরী নিযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আর সম্পত্তি সংরক্ষণে নিজ লোক নিযুক্ত করিতে হয় না। ধর্ম্মাধি-

করণ ও বিচারের সৃষ্টি হওয়াতে দুর্বৃত্তদের মনে সদাই আশঙ্কা হয় যে ধরা পড়িলে কঠোর শাস্তি পাইবে এবং কারাগারই তাহাদের আশ্রয়স্থান হইবে। ইহা ভাবিয়া অনেক সময় তাহারা অপহরণ ও লুণ্ঠন করিতে ক্ষান্ত হয়। এজগতে পরিশ্রম না করিয়া ধন লাভের ইচ্ছা অনেকেরই বলবতী। এজন্য পরিশ্রম বিনিময়ে অপরের লব্ধ সামগ্রী অনায়াসে অপহরণ করিবার লোভ অনেকেই সম্বরণ করিতে পারে না। কিন্তু কারাগার বিধি তাহাদিগকে পরিশ্রম করাইয়া শরীর ধারণোপযোগী অন্নদান করিয়া, স্পষ্টই শিক্ষা দেয় যে, বিনা পরিশ্রমে কিছুই লাভ করা যায় না।

সৈন্য ও রণতরী রক্ষা করিতে, প্রজামাত্রেরই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে, সুলভে আহারীয় ও ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীর পরিচালন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত রেল খাল রাস্তার বিস্তার সাধন করিতে, দুর্ব্বিনীত দস্যু তস্কর ও ধূর্ত্ত জুয়াচোরগণকে ধর্ম্মাধিকরণ সাহায্যে দণ্ড দিতে, দেশের শিক্ষা বিস্তার করিতে, ডাক বিভাগের সুলভে সুবন্দোবস্ত করিতে, এবং অন্যান্য মঙ্গলময় অনুষ্ঠান করিতে, রাজ্যে অর্থের আবশ্যক হয়। এই অর্থ দেশের প্রজারাই দিয়া থাকে। নিজ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে যে প্রভূত অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত, তাহার তুলনায় স্বাস্তর নিমিত্ত যে অল্প পরিমাণ অর্থ প্রজাগণ রাজ্যে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে দিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহাই রাজস্ব। রাজা উহা অপহরণ করিতে গ্রহণ করেন না।

আমরা কোন সামগ্রী লাভ করিতে আমাদের শ্রমলব্ধ অর্থব্যয় করিয়া থাকি। অর্থাৎ অর্থ বিনিময় করিলে অধিকারী হইতে বিচ্যুত হইয়া সামগ্রী আমাদের হস্তগত হয়। উহা ব্যবহার বা হস্তান্তর করিবার স্বত্বে আমরা স্বত্ববান্ হই। যেখানে অর্থ বিনিময়ে আমরা কিছু পাই না আমরা মনে করি যে সেই অর্থ আমরা দান করিলাম। কিন্তু যখন

জোর করিয়া আমাদের নিকট অর্থ কেহ কাড়িয়া লয় তখন আমরা মনে করি উহা অপহৃত হইল। রাজ্য হইতে রাজস্ব কিন্তু জোর করিয়া গৃহীত হয়। এই রাজস্ব না দিলে ধর্ম্মাধিকরণে আমরা দণ্ডিত হই। এইজন্য অনেকের ধারণা যে রাজস্ব দেওয়া অসদ্ব্যয়। কিন্তু রাজ্য হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক রেল খাল রাস্তা বিস্তার করিয়া দ্রব্যাদির গমনাগমনের যে সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে দ্রব্যাদি স্থান জনিত মূল্যযুক্ত হইয়াছে। যে চাউল বা তরিতরকারী রাস্তার অভাবে আসিতে পারিত না, স্থানীয় মূল্যে বিক্রীত হইত, অধুনা রেল খাল ও রাস্তার বিস্তারে তাহারা অধিক মূল্য যুক্ত হইতেছে, এবং রাজ্যের অন্যান্য দেশের অভাবদূর করিতেছে। ইহাতে উৎপাদক দেশ সমূহের জমির খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে, কৃষকদেরও মজুরী বৃদ্ধি হইতেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহারা সম্পত্তি করিতেছেন, উঁহার বংশপরম্পরায় ভোগ দখল হইতেছে। দস্যু তস্করের হস্ত হইতে নিরাকৃত হইয়া তাহারা রাত্রে নিদ্রা যাইতেছে। অতএব রাজস্ব, দানের বিষয় নহে এবং উহা গ্রহণ করা অপহরণ নহে। রাজ্যে সুখে বসবাস করিবার বিনিময়েও উহা প্রদান করা হয় না। যেরূপ দেবতাকে লোকে ভক্তিভরে অর্ঘ্য প্রদান করে, রাজাকেও আমরা সেই ভাবে রাজস্ব প্রদান করি। যেরূপ নিজ মাতার বা স্বদেশের প্রতি ভক্তি স্বতঃ প্রণোদিত হয়, হিন্দু হৃদয়ে রাজভক্তি সেইরূপ ভাবেই জাগরিত হয়। মাতা যেরূপ সন্তান সম্বন্ধে দোষ করিতে পারেন না, অথবা সন্তানের নিকট যেরূপ মাতার দোষ কোনরূপে দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রজার নিকট রাজার কোন অপরাধ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত ইংরাজী ব্যবহারশাস্ত্রে King can do no wrong লিখিত হয়। প্রজাকে শাসন, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং অরাজকতা হইতে ত্রাণ, ইত্যাদি যে সকল গুণের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিচার করিয়া রাজাকে ভক্তি করিতে হইলে, অনেক সময় বহুকাল নিরুদ্বেগে

বসবাস করিতে করিতে ঐ সকল গুণের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, এবং রাজভক্তি লোপ পাইতে থাকে। এ কারণে রাজাকে দেব ভাবে অবলোকন করিবার কথাই হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। এই নিমিত্ত মানব ধর্ম্মসংহিতায় লিখিত আছে যে “ভূপতি বালক হইলেও, সাধারণ মনুষ্য ভাবিয়া অবমাননা করিবে না, কারণ মহতী দেবতাই এই নররূপে অবস্থিতি করেন। ইহলোক অরাজক হইলে ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হয়। এই সকলের রক্ষার্থ বিধাতা ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের সারভূত অংশ আকর্ষণ করিয়াই রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন।”

পরিশ্রম ও মিতব্যয়ই ধনাগমের একমাত্র উপায়।

সভ্য মানবের অভাব অধিক। এবং যে স্থানে যে সময়ে যে সামগ্রীর অভাব অধিক পরিদৃষ্ট হয়, উহা সেই স্থানে মূল্যবান্ ধন সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং উহার উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া লোকে ধন সামগ্রী লাভের পন্থা উন্মুক্ত করে। কিন্তু সকল সামগ্রীর উৎপাদন ও প্রস্তুত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা উৎপাদন ও প্রস্তুতি কার্য্যে নিযুক্ত, তাহারাই ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় করিবার ভার লইতে পারে না। এই কারণে জগতে উৎপাদক, শিল্পী, দালাল, বণিক্, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ইহারা যে ব্যবসায় করেন তাহার মূলে পরিশ্রম নিহিত। ব্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ বিশেষরূপে শেষপর্য্যন্ত উদ্যম করা। এবং “উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ” অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন ইহা একটী মহাজন বাক্য।

এ জগতে খাদ্য পানীয়ের জন্য নানাবিধ শস্য, পরিষ্কৃত জল, ঘৃত, দুগ্ধ, ইত্যাদি, অঙ্গরক্ষার জন্য তূলা ঊর্ণা ও রেশমের বস্ত্রাদি, বাসের জন্য

পাকাঘর, চালাঘর ইত্যাদি, অন্ন পাকের নিমিত্ত জ্বালানি কাষ্ঠ, পাতুরে কয়লা ইত্যাদি, রোগের নিমিত্ত ঔষধ পথ্যাদি, এবং সখের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রীর আবশ্যক। এবং এই সকল বাস্তব সামগ্রী ভূগর্ভ বা নদীগর্ভ অথবা সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হয় এবং পরে মূলধন ও পরিশ্রমের সাহায্যে নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের অভাব মোচন করে। কিন্তু ফল ভরে অবনত বৃক্ষলতাদিপরিশোভিত উর্ব্বর রত্নগর্ভ ক্ষেত্রমধ্যে বাস করিয়া কর্ম্মফলা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের অভাবে অসভ্য মানবজাতি আহারের জন্য লালায়িত হয়। অসভ্যজাতি হইতে সভ্যজাতির অভ্যুদয়ে পরিশ্রম সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। কারণ প্রকৃতির দান ত আছেই, উহা পরিশ্রমের সাহায্যে ভোগে না আসিলে, স্বস্থানে থাকা না থাকা সমান কথা। কয়লা যদি খনির মধ্যেই রহিয়া গেল, পরিষ্কৃত পাণীয় জল দূর আছে বলিয়া ভোগ না করিয়া যদি অশুদ্ধ জল পান করিতে হয়, ও সেই কারণে রোগ হয়, তন্তুসার বৃক্ষের তন্তু পরিশ্রমের সাহায্যে বয়ন ব্যতীত পরিধান করিতে পারা যায় না বলিয়া যদি বৃক্ষেই রহিয়া গেল, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রীতে ধনাগম হইতে পারে না। অতএব ঐ সকল সামগ্রী মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত করিতে হইলে উৎপাদন ও প্রস্তুতি কল্পে উহাতে পরিশ্রম নিয়োগ করিতে হইবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে যেমন পরিশ্রমের আবশ্যক, সেইরূপ ঐ সকল সামগ্রী ভোগ করিতে হইলেও অর্থের আবশ্যক। এবং অর্থ বিনা পরিশ্রমে লাভ করিতে পারা যায় না। দস্যু তস্কর ব্যতীত কেবল আলস্যে দিনাতিপাত করিয়া কেহই বাস্তব ধন সামগ্রী ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং পরিশ্রম না করিয়া কেবল প্রতিভাগুণে কেহই অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন যে ধনবানের পুত্র বিনা পরিশ্রমে নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করে, কিন্তু সে

ব্যক্তি যে সকল সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কখনই বিনা পরিশ্রমে আদৌ লাভ করা হয় নাই। যে সামগ্রী বিনাপরিশ্রমে পাওয়া যায়, যথা বায়ু বা নদীর জল, তাহার বিনিময়ে কেহ কিছুই দিতে স্বীকার করে না। কিন্তু এই হাওয়া বা জল পাইতে পরিশ্রমের আবশ্যকতা থাকিলে উহারা মূল্যযুক্ত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল সামগ্রী ভোগ করিতে হইলে শ্রমনিয়োগকারীকে অর্থ প্রদান করিতে হয়। এই অর্থ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়, অথবা কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়, এবং এই পরিশ্রম ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের অর্থাগমে সহায়তা করে। দুরন্ত শীতে অথবা নিদাঘের প্রচণ্ড খরতাপে কৃষকদিগের কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা কাহারও অবিদিত নাই। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইত্যাদি বিদ্যালাভ করিতেও যে মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহাই বা কে না স্বীকার করিবে? বণিকের মানসিক চিন্তা, অবিরাম পরিশ্রম ও ব্যবসায় জনিত উদ্বেগ, ইত্যাদি সকলের বিদিত আছে।

মানব মাত্রেই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্যত হয়, এবং স্ব স্ব সমাজের নিমিত্ত ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সকলকেই উদ্যম ও অধ্যবসায় গুণে, অথবা পরিশ্রম করিয়া, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে, অন্য সামগ্রী ভোগ করিয়া, জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হয়। এই নিমিত্ত কেহ বা সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে, কেহ বা উৎপন্ন সামগ্রীকে রূপান্তরিত করিতেছে, কেহ বা ঐ গুলিকে অন্য স্থলে লইয়া গিয়া অথবা অধিক কাল মজুদ রাখিয়া অধিক মূল্য যুক্ত করিতেছে, কেহ বা ঐ সকল সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেছে, আবার কেহ বা ওকালতী বা চিকিৎসা করিয়া

বা বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্য্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণ সামগ্রীভোগ করিতেছে, উহা তাহার পরিশ্রমের বিনিময়ে লাভ করিতেছে।

যদিও আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে ভোগের নিমিত্ত অন্য ধন সামগ্রী প্রাপ্ত হই বটে, তথাপি ধন ভোগের কোন নিয়ম পালন না করিলে আমাদের উপার্জ্জিত অর্থের মিতব্যয় করা হয় না। মিতব্যয় একপ্রকার ব্যয়ের নাম, মিতব্যয় বলিতে সঞ্চয় বুঝায় না। অল্পকাল ভোগসাধ্য সামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম অমিতব্যয়। নিতান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য সামগ্রী বিশেষ, যাহার ভোগান্তে শরীরের বল, স্বাস্থ্যের উন্নতি, এবং মানসিক উন্নতি হয়, অথবা যাহা সম্পত্তি রূপে পরিণত করা যাইতে পারে, পরিশ্রমোৎপন্ন ধনের বিনিময়ে ঐ সকল সামগ্রী ভোগের নিমিত্ত ব্যয় করার নাম মিতব্যয়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করিলেই ধনাগম হইয়া থাকে।

যাহাই কেন ঘটুক না কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে।

ধননাশের সম্ভাবনা অথবা অপযশের সম্ভাবনা থাকিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে, কিংবা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে, সকলে সমর্থ নহেন। এই কারণে ঐ জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহারা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা জগতে সকলের বরেণ্য ও নমস্য হইয়াছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি লিপিবদ্ধ হইয়া অক্ষয় হইয়াছে। এই জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল অনন্যসাধারণ নহে—অলৌকিক। অর্থাৎ এই জাতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অপালন তত দোষাবহ নহে, কিন্তু পালনে জগৎ চমৎকৃত হইয়া থাকে। যদি প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া, অথবা অর্থব্যয় করিয়া, অথবা অপরে অপযশ রটাইবে এই ভয় না করিয়া, কর্ত্তব্য

পালনে অগ্রসর না হওয়া যায়, তাহা হইলে এ জগতে অনেককে নিন্দা ভাজন হইতে হয় না। অতএব প্রাণনাশের আশঙ্কা যে কর্ম্মে আছে তাহা সম্পাদন করিবা কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে ত কেহই নিন্দা করিবে না। এই শেষোক্ত কর্তব্য কর্ম্ম যাঁহারা সম্পাদন করিয়া বরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ মহত্ত্ব, অথবা ঐশ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে যখন স্বর্গীয় নফর চন্দ্র কুণ্ডু ড্রেণের মধ্য হইতে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার মাতা পুত্রশোকাতুরা ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী বিধবা হইবেন, এবং তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন কল্পে দেশবাসী ও সাহেব সুবা সকলে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন, এ সকল কথা কখনই তাহার মনে তখন উদিত হয় নাই। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার জন্যই তিনি আজ দেশ পূজ্য। অন্য পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, সেই ড্রেণের নিকট অপর যাহারা, পত্নী বিধবা অথবা সন্তান সন্ততি আশ্রয় হীন হইবে ভাবিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জনে পশ্চাৎপদ হইয়াছিল, তাহাদের ও কেহ নিন্দা করে না। অতএব যে কর্ত্তব্য বৃত্তিসূত্রে পালিত হয় নাই এবং যাহা পালন না করিলে নিন্দাভাজন হইতে হয় না, এবং পালন করিলে জগতের লোক চমৎকৃত হয়, তাহাই আদর্শ কর্ত্তব্য পালন।

“প্রবল বৃষ্টিপাতে গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রকায়া যমুনা নদীর দুকূল ভাসিয়া গিয়াছিল। জলস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইয়া নদীবক্ষের ক্ষুদ্র সেতু ধ্বংশ করিয়াছিল। কিন্তু রেলওয়েকর্ত্তৃপক্ষগণ সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই। গোবরডাঙ্গা হইতে মছলন্দপুর পর্য্যন্ত সমস্ত রেলপথ ভাসিয়া গিয়াছিল, লৌহ রেল উপরে ভাসিতেছিল, রেলের নিম্নস্থ ইট পাথর ও মৃত্তিকা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সেদিন খুলনা হইতে একখানি ট্রেন দ্রুতবেগে সেই ভগ্নস্থান অভিমুখে আসিতেছিল। একজন ধীবর সেখানে মাছ ধরিতেছিল। সে শত শত লোকের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া গাড়ী থামাইবার জন্য আপনার পরিহিত বস্ত্রখানা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিল। ড্রাইভার সঙ্কেত বুঝিতে পারিল না। গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল। আর দুই তিন মিনিট মধ্যেই সমস্ত যাত্রীসহ গাড়ী নদীগর্ভে পতিত হইবে। ধীবর নিজের প্রাণের মায়া ভুলিয়া গেল, সে গাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, এবং বস্ত্র সঞ্চালন করিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। ড্রাইভার সম্মুখে একজন মানুষ দণ্ডায়মান দেখিয়া, গাড়ী থামাইল। ধীবরের ধর্ম্মবুদ্ধিতে শত শত লোকের প্রাণরক্ষা হইল। ৩০।৪০ হাজার টাকা মুল্যের রেলগাড়ী রক্ষা পাইল। এই ধীবরের সহৃদয়তা ও প্রত্যুৎপন্ন মতির তুলনা পৃথিবির ইতিহাসে বিরল।" *

পাঠানদিগের কারাগারে আবদ্ধ রাজসিংহকে যখন কতলুখাঁর সেনাপতি ওস্মান, কার্য্যসিদ্ধির জন্য কারামুক্তির লোভ দেখাইয়া, অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, "যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হয়েন, তবে তিনি (মহারাজ মানসিংহ) সম্মত হইতে পারেন," তাহাতে জগৎসিংহ বলিলেন "আমি পিতৃ সন্নিধানে যাইতে অস্বীকৃত নহি।" ওসমান বলিলেন "শুনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু আরও নিবেদন আছে, আপনি যদি এরূপ সন্ধি সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে আবার দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অঙ্গীকার করিয়া যান।" জগৎসিংহ কহিলেন "আমি অঙ্গীকার করিলেই যে প্রত্যাগমন করিব তাহার নিশ্চয় কি ?’ ওস্মান হাসিয়া কহিলেন "তাহা নিশ্চয় বটে। রাজপুতের যে বাক্য লঙ্ঘন হয় না, তাহা সকলেই জানে।" রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন

---

* সঞ্জীবনী হইতে "চরিত্রগঠনে" উদ্ধৃত।

"আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, পিতার সহিত সাক্ষাতের পরই দুর্গে প্রত্যাগমন করিব।" ওসমান কহিলেন "আর কোন বিষয়ও স্বীকার করুণ, তাহা হইলেই আমরা নিঃশেষ বাধিত হই। আপনি যে মহারাজের সাক্ষাৎলাভ করিলে আমাদের বাসনানুযায়ী সন্ধির উদ্‌যোগী হইবেন, তাহাও স্বীকার করিয়া যাউন।" রাজপুত্র কহিলেন "সেনাপতি মহাশয়! এ অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না, দিল্লীর সম্রাট আমাদিগকে পাঠান জয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।" ওস্‌মানের মুখভঙ্গিতে সন্তোষ এবং ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল, কহিলেন "যুবরাজ! আপনি রাজপুত্রের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মুক্তির আর উপায় নাই।" জগৎসিংহ বলিলেন "আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কি? রাজপুত কুলের অনেক রাজপুত্র আছে।" বাস্তবিক পক্ষে এক দিকে কারাবাস যন্ত্রনা চাইকি প্রাণনাশ, অপর দিকে কর্ত্তব্য পালন, ইহা কি প্রশংসনীয় নহে? অবশ্য প্রশংসনীয়, তথাপি ইহা প্রথমোক্ত বা দ্বিতীয়োক্ত কর্ত্তব্য পালনের সমান হইতে পারে না। কারণ জগতসিংহ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক পাঠান দমন করিবার জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তিসূত্রে কর্ত্তব্য অপালনে দোষ হইত।

বিপদ সংকুল পথে বা কর্ম্মে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদের মধ্যে অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্য পরায়ণতার অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই কারণে সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে কর্ত্তব্যপরায়ণ অনেক মহাপুরুষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধ ঘটিলেই উভয় পক্ষেরই সৈন্যক্ষয় হয়, এবং যাহারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে তাহারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে নাই একথা কেহ বলিবে না। তথাপি জয়িপক্ষেরা অধিকতর কর্ত্তব্য পরায়ণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ট্রাফেলগার যুদ্ধে নেল্‌সন সঙ্কেত দ্বারা নিজপক্ষীয়

রণতরী সমূহের নৌ সৈনিকদের জানাইলেন "ইংলণ্ড আশা করেন যে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।" ইহাতে নেলসনের কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অধিকন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে যে তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ করা যায়, তাহাও নেলসনের শেষ উক্তি হইতে উপলব্ধি করা যায়। এই যুদ্ধে স্বীয় পক্ষের জয়লাভ হইয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "ভগবৎ কৃপায় আমি যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছি ইহার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি।" যখন উভয় পক্ষেই সেনা নিহত হইয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয় নাই বুঝিতে হইবে, তবে জয় পরাজয় সৈন্যাধ্যক্ষের কৌশলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমরা যখন ফরাসীবীর লাটুর দোবাণের বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাকে শীর্ষস্থান দিয়া থাকি, কারণ যে গিরিসঙ্কটের মধ্যদিয়া শত্রুপক্ষ অষ্ট্রীয়ান্ সৈন্য ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, সেই স্থানের সম্মুখ ভাগে ফরাসীদিগের দুর্গের লোকদের সতর্ক করিতে আসিয়া লাটুর যে বীরত্ব ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতে বিরল। একাকী দুর্গরক্ষা করিতে কেহ তাঁহাকে আদেশ দেন নাই, কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহাকে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন। লাটুর আসিয়া দেখিলেন যে, বিশাল সেনাদলের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দুর্গস্থ ফরাসী সৈন্য পলায়ন করিয়াছে, অথচ শত্রুদিগের গতি কিছু কালের নিমিত্ত রোধ না করিলে, পরে তাহাদিগকে পরাস্ত করা কঠিনতর হইবে।অতএব আদিষ্ট না হইলেও লাটুর একাকী এই কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া কতকগুলি পাষাণ খণ্ড স্থাপন করিলেন , বন্দুকের স্থানে গুলি বারুদ ভরিয়া বন্দুক স্থাপন করিলেন , এবং নিশাগমে সৈন্যগণের পদক্ষেপ শুনিবা মাত্র বন্দুক ছুড়িলেন। অমনি শত্রুর গতি রুদ্ধ হইল—চিন্তার কারণ উপস্থিত হইল। থার্ম্মপলির

গিরিসঙ্কটে অসংখ্য পারস্ত সেনার ধ্বংস হইয়াছিল, অতএব যে স্থানে দুই বা তিন জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে হয়, তথায় অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়। এই কারণে অষ্ট্রীয়ান্ সেনাপতি শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পন করিতে বলিলেন। লাটুর উত্তর দিলেন "প্রাণ থাকিতে সমর্পণ করিব না।" অমনি অষ্ট্রীয়সৈন্য অগ্রসর হইল ও লাটুরের গুলিবর্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবার একবার শত্রুপক্ষের চেষ্টা হইল ও অনেক সৈন্য হত হইল। এইবার পুনরায় শত্রু সেনাপতি, আত্মসমর্পণ করিলে প্রাণহানি করিবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, এবং একা একশ, লাটুর, পর দিন প্রাতে সশস্ত্রে যাইবার অনুমতি পাইলে, আত্মসমর্পন করিবেন বলায়, সেনাপতি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে শত্রুপক্ষ কেবলমাত্র লাটুরকে বহির্গত হইতে দেখিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক যে কার্য্য করিতে লাটুর আদিষ্ট হয়েন নাই, আজ মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা সম্পাদন করিলেন। তিনি এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলেও কেহ তাহার অপযশ করিত না, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য পালনে জগৎ চমৎকৃত হইল।

এইবার আমরা অন্য প্রকার কর্ত্তব্যের কথা বলিব। অর্থাৎ অর্থনাশের বা মানহানির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দেশের বা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত, অথবা নিজ বিচার শক্তিতে যাহা করা উচিত, তাহা করিতেই হইবে বলিয়া যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই কথা বলিব। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে ভাবিয়া সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বোধ—হয় পুস্তকাদি লিখিয়া তিনি অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিবেন বলিয়াই বুঝি এইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ যখন দেশহিতকর দানে ব্যয়িত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পদত্যাগ কেবল দেশের উপকার করিবার অধিকতর সামর্থ্য লাভ করিবার হেতু মাত্র।

প্রবাদ আছে,—গিয়াসউদ্দীন একদা শরচালনা অভ্যাস করিবার সময় হঠাৎ একটি দুঃখিনী বৃদ্ধার পুত্রকে শরবিদ্ধ ও হত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা সুলতানের বিরুদ্ধে কাজির নিকট অভিযোগ করিল। কাজি ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। স্বয়ং রাজা অপরাধী ইহা জানিয়াও তিনি যথাশাস্ত্র বিচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দৈবাৎ নরহত্যা করিলে তৎকালে যে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, রাজাকে তাহা দিতে বলিলেন। রাজাও দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন এবং বিচারালয় হইতে চলিয়া যাইবার সময় কাজিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "এই তরবারি দেখিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ যদি রাজা বলিয়া আপনি আমাকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে ইহার আঘাতে আপনার শিরশ্ছেদ করিব"। এই কথা শুনিয়া কাজিও নিজের পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে একখণ্ড বেত্র বাহির করিয়া বলিলেন "এই বেত্র দেখিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আপনি যদি আমার আদেশ প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে স্বহস্তে এই বেত্রাঘাতে আপনার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিব"। আজ আমাদের উভয়েরই কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং ভগবানের কৃপায় আমরা উভয়েই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি।*

এই শেষোক্ত উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যিনি জীবনের যে কোন বৃত্তিই অবলম্বন করুণ না, তাহাকে সেই বৃত্তি—অনুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব সামান্য ভৃত্য হইতে আফিসের কর্ত্তা, সৈনিক হইতে সেনাপতি, নাবিক হইতে জাহাজের কাপ্তেন ইত্যাদি

---

* "ভারতবর্ষের ইতিহাস"

কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ সকল ব্যক্তিরই যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা উচিত। সংসারে, সমাজে, সাম্রাজ্যে এবং বিদ্যালয়েও এক এক ব্যক্তির এক এক বিষয়ে এক এক প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমার পালন করা উচিত" এভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়জন তাহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখায়? যদি কর্ম্মচারী বিনা শাসনে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত, এবং আফিসের কর্ত্তা সর্ব্বদাই আফিসের ও কর্ম্মচারীদের মঙ্গল সাধনে অনন্যমনে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন, কি যুদ্ধ সময়ে, কি শান্তির সময়ে, যদি সৈনিক সমস্ত বিষয়ে, সকল আজ্ঞা পালন করিত, এবং সকল সেনাপতিই যথাসাধ্য দেশের ও সৈনিকদের মঙ্গল সাধন কল্পে অনুপ্রাণিত হইতেন, যদি প্রত্যেক নাবিক কি নিরাপদ কি বিপদের সময়, সমভাবে শাসনের বশবর্ত্তী হইত, ও জাহাজের কাপ্তেনও তাহাদের, যাত্রীদের ও মালিকের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতেন, যদি সংসারে সকল মাতা পিতা, সকল পুত্র কন্যা, সকল গুরুজন ও সেবক জন, শিক্ষক ও ছাত্র, রাজা ও প্রজা, তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতেন, তাহা হইলে এত গণ্ডগোল ও গোলযোগ, এত সাংসারিক, সামাজিক, বিদ্যালয় সংঘটিত ও রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অতৃপ্তির আর্ত্তনাদে জগৎ আলোড়িত হইত না। অতএব বিরল ও অলৌকিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা ত পরের কথা, নিত্য যাহা কর্ম্মসূত্রে, বা সংসারসূত্রে, বা বিদ্যালয় সূত্রে, বা সাম্রাজ্য সূত্রে, যে কর্ত্তব্য পরায়ণতার আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তাহা যদি পরিদৃশ্যমান হইত, তাহা হইলে এজগতে স্বর্গসুখ অনুভব করা যাইত। যে দেশের লোক যে সময়ে যে বৃত্তিতে বা যে সম্বন্ধে যেরূপ করা উচিত, তাহা যদি পালন করেন, তাহা হইলে সে দেশ ধন্য, সে দেশের গৃহস্থ, সামাজিক ব্যক্তি, ভৃত্য, কর্ম্মকর্ত্তা ইত্যাদি সকলেই ধন্য।

দীর্ঘ সূত্রতা।

To-morrow and to-morrow and to morrow,
Creeps in this petty pace, from day to day,
To the last syllable of recorded time ,
And all our yesterdays have lighted fools,
The way to dusty death"

"আজ থাক কাল করিব" বলিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পাদিত রাখার নাম দীর্ঘসূত্রতা, এবং আলোচনা না করিয়া পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার নাম অবিমৃশ্যকারিতা। অতএব দীর্ঘসূত্রতাও যেরূপ দোষ অবিমৃশ্যকারিতাও সেইরূপ দোষ। এই নিমিত্ত পাছে দীর্ঘসূত্রী বলে বলিয়া অনেকে আলোচনা পূর্ব্বক পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে সময় লয়েন না এবং পাছে লোকে অবিমৃশ্যকারী বলে ভাবিয়া "আজ থাক কাল করিব" বলিয়া অনেকে নিজ বৃত্তি অনুযায়ী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পাদিত রাখেন। বাস্তবিক এই ভুল বিশ্বাসের বা অভ্যাসের মূলে আলস্য অথবা শ্রমবিমুখতা। কার্য্যসম্পাদন করিতে যেরূপ পরিশ্রম আবশ্যক, সেইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উহার ফলাফল আলোচনা করিতে মানসিক পরিশ্রম আবশ্যক। এই পরিশ্রম করিতে যাহারা কাতর তাহারাই দীর্ঘসূত্রী, তাহারাই অবিমৃশ্যকারী। বাস্তবিক পক্ষে যাহাদের প্রাত্যহিক আহারের নিশ্চিন্ততা আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অল্পাধিক পরিমাণে অলস। প্রথমতঃ তাহারা চিন্তা করিতে অনিচ্ছুক, দ্বিতীয়তঃ যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে ততোধিক অলস, এবং শেষতঃ কার্য্যে পরিণত করিতে আরও অলস। অনেকে আবার প্রতিবাদ ভয়ে অথবা অবকাশ সময় সংক্ষিপ্ত হইবে ভাবিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া ফেলিয়া রাখেন।

কতকগুলি কার্য্য আছে যে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে "অদ্য যাহা করিতে পার কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না"। আবার কতকগুলি কার্য্য আছে যে সম্বন্ধে "সবুরে মেওয়া ফলে" বলা যাইতে পারে।* যে সকল কর্ম্ম, বৃত্তিসূত্রে নিত্য যথা সময়ে করা উচিত, সে কর্ম্ম না করিলে দোষের হয়। ইস্কুলের বালক যদি নিত্যকার পাঠ অভ্যাস না করিয়া পরে করিয়া লইব বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়, যদি উপস্থিত বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত পাঠে অবহেলা করে, তাহা হইলে শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। নিত্যকার পাঠ অভ্যাস করা তাহার নিত্যকর্ম্ম, অতএব সে অদ্য যাহা করিতে পারে তাহা যদি কল্যকার জন্য ফেলিয়া রাখে তাহা হইলে তাহার কল্য অনন্তকালে পরিণত হইবে। পরীক্ষার সময় ও পরে তাহার আক্ষেপ হয়—কেন কল্য কল্য করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। অথচ যে বালক তাহার মত প্রতিভাবান্ নহে, দিবারাত্র যে সময়ের যে কাজ সেই সময়ে তাহা সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে, সেও অবলীলাক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনেক সময় আবার কল্য করিব করিতে করিতে পূজা বা গ্রীষ্মের অবকাশে করিব এইভাব উপস্থিত হয়, এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়া, বা অন্যান্য অভাবনীয় বিপৎপাতে, ইচ্ছা থাকিলেও পাঠের অবকাশ পাওয়া যায় না। যে সময়ে যে কর্ম্ম করা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করা উচিত নহে, সে সময়ে সেই কার্য্য করা উচিত এবং 'সবুরে মেওয়া ফলে' বলিয়া অপেক্ষা করা উচিত নহে। হয়ত ধান পাকিয়াছে। সে সময়ে ধান না কাটিয়া আজ থাক কাল করিব বলিয়া অপেক্ষা করা দোষ, কারণ কে জানে হয়ত বিষম ঝড় আসিয়া "পাকা ধানে মই" হইতে পারে, অথবা বন্যা আসিয়া পাকা ধান গুলি জল নিমগ্ন করিতে পারে।

যে সকল কার্য্য বা মত প্রকাশ করা উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যদি কল্যকার জন্য রাখিয়া দিলে দোষ না হয়,

তাহা ফেলিয়া রাখা আলস্যের ফল নাও হইতে পারে। যে সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া অদ্য ব্যস্ত হইয়া মত প্রকাশ করিব, কল্য হয়ত আর একটী বিষয় অবগত হওয়ায়, অন্য মত প্রকাশ করিতে হইবে। যে কার্য্য, কলের পুতুলের মত সম্পাদিত করিতে হয় না, সে কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে হইলে তিনটী বিষয় আবশ্যক, যথা — আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কিরূপ ফল আশা করা যাইতে পারে, কি উপায়ে অবলম্বন করা উচিত, এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই উপায় মত কার্য্যারম্ভ করা। অতএব আকাঙ্ক্ষা-অনুযায়ী ফলসম্বন্ধে, অথবা উপায় সম্বন্ধে, অথবা কার্য্যারম্ভ সম্বন্ধে, কিছু সময় লওয়া দোষের বিষয় নহে। অনেক সময় কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অথবা দুই প্রকার কর্ত্তব্যের মধ্যে কোনটী অগ্রে সম্পাদন করা উচিত, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয়। এরূপ স্থলে বিলম্ব করা অর্থে আলস্য বুঝায় না। মহামতি কম্পতের মতে "কাজ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবে, অর্থাৎ চিন্তা কর্ম্মের মূলীভূত হওয়া উচিত, কিন্তু কর্ম্ম সম্পাদনে যেন নির্দ্দয়তা বা আত্মীয়তার অভাব পরিলক্ষিত না হয়।" অতএব ফল লাভ করিতে অধর্ম্মসঙ্গত কোন উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। এ কারণে ধর্ম্মসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহা অবশ্য আলস্যসম্ভূত নহে। অনেক সময় হয় ত অতি বুদ্ধি বশতঃ উপায় নির্দ্ধারণে বিলম্ব ঘটে। অতি বুদ্ধিমানেরা "বাঁশ বনে ডোম কানার" মত হইয়া যান।

ইচ্ছার বশেই মানব কর্ম্ম করিতে উৎসুক হয়, এবং বিবেক মনুষ্যকে সু ও কু কার্য্যের ভেদ করিতে আদেশ করিতেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি ফল হইবে, ইহা চিন্তা করিবার নিমিত্ত অধিক সময় ক্ষেপণ করিতে কোন আদেশই দেন না। এরূপ অনেক বিপদ আছে যেখানে আমাদের বিবেকও সদসৎ বিবেচনা করিতে সময় দেয় না। হয়ত কোন পরমাত্মীয়ের

কঠিন রোগ হইয়াছে, অথবা কোন পোত বিপদে পড়িয়াছে অথবা বাড়ীতে দস্যু আসিয়াছে, এস্থলে প্রতীকার চিন্তা প্রথমে বিবেচ্য। অতএব এই উপায় সম্বন্ধে অল্পসময়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও উহা অবিমৃশ্যকারিতা নহে।

এরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা সুযোগ ক্রমে আবদ্ধ হইলে সুফলপ্রসূ হয় এবং কুযোগে আবদ্ধ হইলে কুফল প্রদ হয়। এ জগতে অবশ্য কেহই কুফল প্রত্যাশা করে না। তথাপি এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা হঠকারিতাবশতঃ, অথবা অতি শীঘ্র সম্পদ লাভ করিবার নিমিত্ত, ভাল মন্দ বিচার অথবা সুযোগের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করে। কিন্তু "জোয়ার আসিয়াছে, সুবাতাস বহিতেছে, তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিবে। নতুবা সুযোগ বহিয়া গেলে সংসার সাগরে যাত্রা করিলে, ক্লেশময় পঙ্কে পড়িয়া, কতবার চড়ায় ঠেকিবে এবং পরিশেষে ভবিতব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে।" নদীতে জোয়ার যেরূপ সকল সময়ে সমান থাকেনা সেইরূপ জীবনেও সকল সময় সুযোগ উপস্থিত হয় না। এবং এক জোয়ার বৃথা চলিয়া গেলে কুবেরের রত্ন ভাণ্ডার অর্পণ করিলেও উহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এ জগতে যাহারাই 'সবুরে মেওয়া ফলে' বলিয়া সুযোগের নিমিত্ত সহস্র লোচনে অপেক্ষা করিয়া পরে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় উহার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারাই বড় হইয়াছেন। যাহারা অতি শীঘ্র বড় হইবার মানসে কুযোগের কুবিধা গ্রাহ্য না করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহারাই অন্ধকারে ঝাপ দিয়াছেন, কখন হয়ত অতি কষ্টে অবসাদের আবর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে ভীত হইয়াছেন এবং সমস্ত ভবিষ্যত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

শুভকর্ম্ম কিন্তু শীঘ্রই সম্পাদন করা উচিত। যে কার্য্য করিলে নিজ সংসারের বা সমাজের বা দেশের বা সকলের মঙ্গল হয়, তাহা মনোমধ্যে

উদিত হইলেই সম্পাদন করা বিধেয়, কারণ যাহা প্রথমে আমাদের মনে উদিত হয়, উহা পরে নানা স্বার্থসম্ভূত আলোচনায় বিকৃত-ভাবাপন্ন হইতে পারে।

পণ্ডিতেরা নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতাকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আলস্য।

এ জগতে আমরা দেখিতে পাই, এক প্রকার লোক আছে যাহারা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম করিবে না অথচ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অপরের শ্রমলব্ধধনের ভাগিদার হয় বা হইতে ইচ্ছা করে, আর এক প্রকার লোক আছে যাহারা আজ থাক্ কাল করিব বলিয়া সম্পাদ্যবিষয়ে অবহেলা করিয়া উহা অসময়ে সমাধা করে, অন্য এক প্রকার লোক আছে, যাহারা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করেন অথচ যে সময়ে যে কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, অনন্যমনে তাহা সমাপন করিতেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণকে আমরা অলস বলিব, দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে আমরা দীর্ঘসূত্রী বলিব, এবং তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে আমরা কর্ম্মী বলিব। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া প্রকাশ্যে অপরের ধনের ভাগিদার হয়, তাহারা হয় ধনীলোকের পুত্র, না হয় ভিক্ষুক, না হয় দস্যু। এবং যাহারা অপ্রকাশ্যে অপরের শ্রমলব্ধধনের ভাগিদার হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা চোর। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর লোক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বিশ্রাম করে

এবং বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া পরিশ্রম করে। যখন জড়জগতই কর্ম্মশীল—তখন জীব জগতের ত কথাই নাই। প্রাত্যহিক আহারের নিশ্চিততা নাই বলিয়া ইতর জীবজন্তু সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিতেছে। অতএব মনে হয়, পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করাই যেন প্রকৃতি দেবীর অন্তর্নিহিত।

অনেকের মনে ধারণা যে, পরিশ্রম না করিয়া যাহারা বিশ্রাম করিতে সক্ষম, তাহারা না জানি কতই সুখী। কিন্তু এ জগতে দুঃখবাহিত্য হইতে সুখ অনুভূত হয়। এবং কষ্ট হইতে যখনই আমরা উত্তীর্ণ হই, তখনই সুখ কাহাকে বলে তাহা অনুভব করিতে পারি। পরিশ্রম করিলেই বিশ্রামের সুখ অনুভব করা যায়, নচেৎ চিরবিশ্রামে কোনও সুখ নাই। আলস্যে যে কেবল সুখ নাই এরূপ নহে,—ইহা নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ ও দীর্ঘসূত্রতার মত একটা মহান দোষ। আলস্যে অনন্ত নৈরাশ্য। অনলস হইবার একমাত্র উপায় কর্ম্মে নিরত থাকা। এবং কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইলে পরিশ্রম করিতে হইবে। আলস্য থাকিলে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং এজগতে এমন কোন্ সামগ্রী বা কর্ম্ম আছে, যাহা অলসের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে? সচরাচর অধিকসংখ্যক মানব কায়িক পরিশ্রম করে। কি কায়িক কি মানসিক নৈষ্কর্ম্য আলস্যসম্ভূত। এবং নৈষ্কর্ম্ম্যে চির-অশান্তি, নৈরাশ্য ভয়, এবং কর্ম্মেই সুখ। মহামতি কার্লাইল লিখিয়াছেন,—"পরিশ্রমই জীবন। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ও সর্ব্বান্তঃকরণে পরিশ্রম করে, তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই আশা জাগরূক থাকে, একমাত্র আলস্যেই অনন্ত নৈরাশ্য। সুতরাং যে কার্য্য তোমার সাধ্য সেইটি জানিয়া লও, এবং তৎসম্পাদনে তোমার সমগ্র শক্তি নিয়োগ কর। কার্য্যেই মনুষ্যের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। শ্রম-সাধ্য অতি সামান্য কর্ম্মেও যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য প্রবৃত্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয়

কিরূপ এক বিচিত্র ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখ। সংশয়, অভিলাষ বিষাদ, পরিতাপ, অমর্ষ, নৈরাশ্য এই সমস্তই, যাহারা অবাধ বিক্রমে স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিকট নিরস্ত হইয়া পড়ে। যে, তাহার কার্য্য সন্ধান করিয়া লইতে পারিয়াছে সেই ধন্য, সে যেন আর অধিক কৃতার্থতার জন্য প্রয়াসী না হয়।"

যেরূপ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে, সেইরূপ জাতি নির্ব্বিশেষে কর্ম্মকুণ্ঠা ও দোষাবহ। যখন আলেক্জাণ্ডার পারস্য দেশ অধিকার করেন, তখন সেই দেশের লোকেদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "ইহারা জ্ঞাত নহে যে, আরামপ্রিয়তা অপেক্ষা অধিকতর সেবক প্রকৃতি আর জগতে নাই। কষ্টের জীবনই রাজভোগ্য।" আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনও অতিশয় আলস্যপূর্ণ। ইংরাজাধিকারে সম্পত্তি সম্বন্ধে অরাজকতার পর স্বস্তিলাভ করিয়া আমাদিগের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা কেবল যে ভুলিয়া গিয়াছেন এরূপ নহে তাঁহারা ১৲ টাকায় পূর্ব্বে অধিক সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিতেন বলিয়া সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অল্পায়াসে অর্থলাভ করিতে আজ পঞ্চাশ বৎসর হইতে সমভাবে ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কর্ম্মশীলা প্রকৃতি দেবী ইচ্ছা করেন না যে, অল্প পরিশ্রমলব্ধ সুখ কেহ নিরবচ্ছিন্ন লাভ করি। তাই আজ দেশে হাহাকার, সমগ্র দ্রব্য দুর্ম্মূল্য এবং আমরা অধিক পরিশ্রম করিব কি মসীজীবীর কর্ম্ম করিব, কি [illegible] করিব, তাহা আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এইবার,—আলস্যই যে হাহাকারের মূল, তাহা আমরা [illegible] চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায়, [illegible] শ্রেণীয়দের মধ্যে প্রায় সকলকেই জাতিগত বৃত্তি শিক্ষা করিতে হয়। অতএব শিক্ষার অভাবে আমাদের কারাগারগুলি পূর্ণ হয় না। কারা-

গারে উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রী দেখিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, এগুলি কেবল শিক্ষানবীশের নহে, রীতিমত হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল লোক আলস্য পরতন্ত্র বলিয়া বিনা পরিশ্রমে অপরের শ্রমলব্ধ সামগ্রী প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে লাভ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে। আলস্যের এমনই প্রভাব যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াও পুনরায় দস্যু বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে ও বারংবারে আনীত হইয়া বিচারককে বলিয়াছে যে, জেলখানার প্রাত্যহিক নিয়মিত আহারের নিশ্চিন্ততায় তাহারা এমনই মুগ্ধ হইয়াছে যে, পরিশ্রম করিয়া নিজ কর্ম্ম অন্বেষণ করিতে তাহারা বীতস্পৃহ।

ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে যে, অলসের মস্তিষ্ক শয়তানের লীলাভূমি। স্মাইলস সাহেব বার্টন হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "আলস্য, শরীরের ও মনের সর্ব্বনাশ সংঘটিত করে, নানাবিধ অনর্থ ও অপকর্ম্মের জন্মদাতা—সাতটী মহাপাপের একটী এবং সয়তানের আশ্রয়। মনের আলস্য শরীরের আলস্য অপেক্ষা ভয়ানক। যেরূপ আবদ্ধ জলে পোকা মাকড ও তৃণগুল্মাদি অনায়াসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অলসব্যক্তির মনে মন্দ ও কুৎসিত চিন্তা আধিপত্য বিস্তার করে ও আত্মাকে কলুষিত করে।" এ জগতে অর্থেই সমগ্র বাস্তব সামগ্রী ভোগ করা যায়। অতএব কায়িক পরিশ্রমে কাতর ধনী ব্যক্তিরা বাসনা ও রসনা পরিতৃপ্তিকর অধিক সামগ্রী ভোগে এমনই নিজের প্রবৃত্তির দাস হয় যে, শেষে স্বকীয় আত্মারূপ প্রভুকেও শাস্তিদানে অক্ষম হয় অতিভোজনের ফলে ক্ষুধার সুখের অভাবে মুখরোচক সামগ্রীতে রুচিহীন হয়েন। তখন স্বর্ণপাত্রে আনীত সামগ্রীও তিনি তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিতে পারেন না। নিজ শরীরভার বহনে

তাহারা অপারক হয়েন, সমস্ত জগৎ সমস্ত আনন্দ, তাহাদের নিকট বিরক্তিকর হয়, তাহারা জীবন্মৃত হয়েন। আবার ইহাদের মধ্যে যাহারা মানসিক পরিশ্রমে বিদ্যা বুদ্ধিলাভ করিতে অলস, তাহাদের ত কথাই নাই। সর্ব্বদাই পরের অপকারে তাহারা সুখানুভব করে। উত্তর পূর্ব্ব চিন্তা করিতে তাহারা ক্লেশানুভব করে, অথচ বর্ত্তমানে মনের সুখ হইবে বলিয়া দাঙ্গা, হাঙ্গামা, প্রজাকে বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত, প্রণয়ীকে দাম্পত্য সুখ হইতে বিচ্যুত, বিধবাকে কুলবহির্গত, ইত্যাদি সমাজ—বিপ্লবকর কর্ম্ম করিতে তাহারা মহাব্যস্ত। একজন পণ্ডিত যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন "মানব অন্তঃকরণ জাঁতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জাঁতার মধ্যে শস্য দিলে জাঁতা উহাকেই চূর্ণ করে, কিন্তু শস্য না দিয়া জাঁতা ঘুরাইলে উহা আপনাকে চূর্ণ করে।"

যেমন দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই, সেইরূপ অলসের ও ছলের অসদ্ভাব নাই। যদি বিদ্যালয়ের কোন বালককে জিজ্ঞাসা করা যায়, "পাঠ কেন সমাপ্ত কর নাই?" তদুত্তরে সে যে সকল কারণ দেখায়, তাহা অনেক সময় অকাট্য বলিয়া অনুমিত হয়। অলসেরা অনেক সময় পাছে পরিশ্রম করিয়া সংবাদ লইতে হয় অথবা শরীর সঞ্চালন করিয়া কোথাও যাইতে হয় বলিয়া ভবিষ্যৎ-জ্ঞানীর ভাণ করিয়া থাকে। প্রচলিত ভাষায় বলে ' কুড়ের অর্দ্ধেক গণৎকার।"

বাস্তবিক পক্ষে অলসকে অতীত বঞ্চনা করিয়াছে, বর্ত্তমান ক্লেশ দিতেছে ও ভবিষ্যৎ ভীতি প্রদর্শন করে। আলস্য ষড়দোষের একটী সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণা।

ধননাশ হইবে বলিয়া যক্ষের মত উপার্জ্জিত ধনসঞ্চয় করিয়া রাখা বা রাখিবার প্রবৃত্তি এক কথা, এবং সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা আর এক কথা। উপস্থিত সুখভোগ স্থগিত করিয়া ব্যয়সংযমের সাহায্যে লোকে ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তিতে বাধা দিয়া, অথচ ভবিষ্যৎ সুখের আশা পরিপোষণকল্পে যত না হউক, অর্থকে উপাস্য দেবতা করিলে সমাজ উহা অনুমোদন করে না। সে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে অর্থ সঞ্চয়ের কারণ দেখাইতে অপারক বলিয়া তাহার অর্থবিষয়ে স্বতন্ত্র মমতা সম্বন্ধে সমাজ সুখ্যাতি করে না। অনেক কম্মবীর অনুমান করেন, জীবনধারণ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত এবং অর্থোপার্জ্জন জীবনের মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত। যাঁহারা নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবন যাপন করেন, তাঁহারা মার্টিনলুথারের মত কেবল মাত্র জীবন ধারণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জনে কতক সময় নিরূপিত করিয়া অবশিষ্ট সময়, নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার কল্পে অতিবাহিত করেন। যাঁহারা প্রতিপালন ও দান করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মত অর্থোপার্জ্জন একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্থই যাহাদের উপাস্য দেবতা—অর্থের বিনিময়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে যাহারা অর্থনাশ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েন—তাহারা যে ঐ কারণে, অর্থাৎ অর্থ পূজা করিতে গিয়া জীবনের কতকগুলি কোমল বৃত্তিকে কঠিন করেন, দানকাতর হয়েন, বাৎসল্য প্রকাশ করিতে অর্থব্যয় থাকিলে, বাৎসল্য গোপন করেন, কিম্বা প্রথমে হৃদয়ে কোন সদ্বৃত্তি

জাগরূক হইলে পরে নানাবিধ হিসাব করিয়া শেষে সে বিষয়ে অর্থনাশ ভয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এমন কি মনোমধ্যে আলোচনা করিতেও কাতর হয়েন, তাহারা সমস্ত জীবনে অর্থ সঞ্চয়ের কারণ দেখাইতে অপারক। তাহাদের অর্থ "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" সঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদের এই অর্থ-সঞ্চয়-বৃত্তি কেহই প্রশংসা করে না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী বা কুনীতি-পরায়ণ ব্যক্তি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহাদের মধ্যে যাহারা কৃপণ নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করে না, তাহারা সমাজ-ভৎসনায় ভীত হইয়া অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে। ইহারা রাত্রিতে অর্থ-মমতায় প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া উহার অন্য কারণ প্রদর্শন করে, বন্ধুর বাটী নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য আহার করিয়া নিজ বাটীতে যদি কখন নিমন্ত্রণ করে, তাহা হইলে বাজারে মৎস্য আসে নাই, ঘোষ দুগ্ধ দেয় নাই, সন্দেশ ওয়ালার দোকান বন্ধ ইত্যাদি অনেক অলীক কথায় কৃপণতার আবরণ করে। কৃপণ অর্থগৃধ্নুদের কাহারও কাহারও এ দোষ লক্ষিত হইলেও তাহারা নিতান্ত নিরীহ এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কৃপণের ধনেও জগতের নানাবিধ মঙ্গল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাদের ধন ব্যাঙ্কে জমা থাকিলেও, কৃতকর্ম্মা লোকে ব্যাঙ্ক হইতে অধিক সুদে ধার করিয়া অব্যবহৃত মূলধনের সদ্ব্যবহার করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সংযমী ব্যক্তিরা উপস্থিত সুখ ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতে সুখের নিমিত্ত ব্যয় সংযম করিয়া ধন বৃদ্ধি করে। এ জাতীয় লোকের বাহ্য আড়ম্বরে ব্যয় সংযম দেখিলে, কেহ তাহাকে দোষ দিবে না। পরন্তু এজাতীয় লোকের সংসারে কদাপি অর্থক্লেশ অনুভূত হয় না। ইহার প্রথম কারণ, সংযমীর সংসারে নানাবিধ সামগ্রী ভোগ লালসার অভাব হেতু অর্থের অভাব বোধ হয় না, দ্বিতীয়তঃ যদি

কোন অভাবনীয় কারণে অর্থের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত অর্থ হইতে সে অভাব পূরণ হয়।

অনুপযুক্ত বা অসংযমী এবং অমিতব্যয়ী ব্যক্তির অর্থ লালসা বৃদ্ধি পাইলে অর্থাগমের নানাবিধ কুটিল বা নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতে থাকে। অশিক্ষিত বা অনুপযুক্ত ব্যক্তি অর্থগৃধ্নু হইলে, সহজেই আত্ম বিক্রয় করিতে তাহাদের দ্বিধাবোধ হয় না। কিন্তু স্কটের মত অমিতব্যয়ী ব্যক্তির অর্থগৃধ্নুতা অমিতব্যয় করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য বুঝিতে হইবে। তিনি বন্ধু বান্ধবকে অনবরত পান ভোজন করাইতে বড়ই ভালবাসিতেন, যে কোন মূল্যে পুরাতন পুস্তক, আলেখ্য ইত্যাদি ক্রয় করিতে ভালবাসিতেন। সেই কারণে তিনি এত ঋণী হইয়াছিলেন যে, সে ঋণ শোধ দেওয়াও অসম্ভব বলিয়া অনেকের নিকট অনুমিত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মভীরু স্কট্ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে বহুবিধ জগৎ-প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া ঋণশোধ করিয়াছিলেন, তাহা জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। নৈতিক ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি অমিতব্যয়ী হইলেও পরে সংযমী হইতে পারেন বলিয়া অর্থগৃধ্নু হইলেও অন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। ইংরাজীতে বলে Avarice is first cousin to luxury বাস্তবিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিলাসিতার সহিত অর্থ লালসার অতি নিকট সম্বন্ধ। অধিকন্তু, কৃত্রিম আরাম ও আনন্দের কৃত্রিমতা ও লুকোচুরি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই মানসিক উচ্চতর বৃত্তির লোপ পাইতে থাকে। একারণে অমিতব্যয়ী অথচ অসংযমী অর্থগৃধ্নুদের নিকট অনেক সময় অন্যায় ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অধিকন্তু বিলাস পরতন্ত্র হইলে মানসিক বৃত্তি নিচয় অনেক সময় শ্লথ হইয়া যায়। কোথায় কষ্ট ও সহিষ্ণুতা মনোমধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবে, না তথায় মানব মন এতই নীচতা প্রাপ্ত হয় যে, অনবরত মিথ্যা আরাম এবং উহার ক্রমিক পরিবর্ত্তন, প্রিয়তম-বৃত্তি

বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অমিতব্যয়িতা আত্মার অতিশয় অনিষ্ট সাধন করে, যেহেতু অমিতব্যয়-জনিত অর্থব্যয় করিতে হইলে, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে।

অনেকের মনে ধারণা অমিতব্যয়ী না হইলে মহানুভব হওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা অমিতব্যয় করিয়া মহানুভব বা দানশীল হইয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় ন্যায় ও কি করা উচিত বা অনুচিত, সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়াছেন। অন্ধের মত এক ব্যক্তির উপকার করিতে হইবেই বলিয়া কাহার অপকার হইল বা কাহার উপকার করা হইল, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে তাহাদের ক্ষমতা থাকে না।

অমিতব্যয়ী অর্থগৃধ্নু, অসংযমী ও অনৈতিক হইলে, অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণাত দূর হয়ই না, পরন্তু নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে তাহার কুণ্ঠা হয় না। অনুচিত অর্থলালসা থাকিলে লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, মার্স্ ক্রোশাস্ তাহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। ইনি একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র। রোম নগরে একপ্রকার রাজকীয় উচ্চপদ ছিল, সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে কেহই সেই পদ প্রাপ্ত হইতেন না। দেশীয় লোকের রীতি, নীতি, আয়, ব্যয় প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিবার ভার, তাঁহারই উপরি অর্পিত হইত। ক্রোশাসের পিতা নিজগুণে এই পদ প্রাপ্ত হইয়া সিজারের ও পম্পের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু এক অসঙ্গত অর্থতৃষ্ণার প্রভাবে তাহারা মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অতিথি সৎকারে তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। দ্বারস্থ ও শরণাপন্ন অতিথিকে তিনি কখন দুঃস্থ ও বিপন্ন করিতে পারিতেন না। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি বড় বলবতী ছিল। তিনি বক্তৃতাবলে অনেক সময় স্বদেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। তৎকালে রোমরাজ্যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, নিরপরাধ

ব্যক্তিরাও অপরাধী বলিয়া দণ্ডিত হইত, কিন্তু ক্রোশাস যুক্তিগর্ভ বচন পরিপাটী দ্বারা বিচারকের মনে তাহাদিগের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিতেন। বিনয়নম্রতা গুণও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি একজন অতি উচ্চপদস্থ লোক হইলেও সামান্য ব্যক্তির নমস্কার গ্রহণ করিয়া প্রতি-নমস্কারেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ও তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল।

কিন্তু এতাদৃশ সদ্গুণশালী হইলেও ধনের লোভে তিনি অশ্রদ্ধেয় কর্ম্মেও লিপ্ত হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি যে অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাকে একটি উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিয়া পুনর্ব্বার তাহা খুলিয়া লইয়াছিলেন। ক্যাটিলাইন যখন ষড়যন্ত্র করিয়া রোম নগরীর উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হন, তখন ক্রোশাসও অর্থাগমের প্রত্যাশায় তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রোমের বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার সম্পৎকাল উপস্থিত হইত। রোমে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া সল্লা যখন সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন, ক্রোশাস ও তখন সুবিধা পাইয়া স্বল্পমূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন। রোমের গৃহ সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল। একবার অগ্নি লাগিলে বহুসংখ্যক গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইত। অগ্নি লাগিলে যখন গৃহস্থগণ সর্ব্বনাশের ভয়ে হাহাকার করিত, অর্থগৃধ্নু ক্রোশাসও তখন মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন। তিনি গৃহস্বামীদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া দহ্যমান ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গৃহ সকল ক্রয় করিয়া লইতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক কর্ম্মকার, সূত্রধর, ও ভাস্কর ভৃত্য ছিল। তিনি ঐ সকল গৃহের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া ভাড়া দিতেন। ক্রোসাস পম্পি ও সিজারের সহিত যোগ দিয়া বলপূর্ব্বক দেশ বিভাগ করিয়া লইতেন। যখন তিনি পার্থিয়াবাসিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করেন, তখন আটিয়স

তাহাকে তথায় যাইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোসাস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি ক্রোসাশের গতিরোধ করিবার জন্য রোমের বহির্দ্বারে ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। রোমে এইরূপ সংস্কার ছিল যে, অভিসম্পাত হইলে ভয় জন্মিবে, এবং ভয় জন্মিলে সঙ্কল্পিত বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। প্রত্যাবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, অবাধে গন্তব্য স্থানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অবশেষে শত্রু কর্ত্তৃক একটী বৃহৎ বালুকাময় প্রান্তরে নীত হইয়া সপুত্র ও সসৈন্য নিহত হইলেন। ক্রোশাসের ধনলোভেই নিষ্কলঙ্ক রোম কলঙ্কিত হইয়াছিল। "লোভেই পাপ ও পাপেই মৃত্যু" এই চিরন্তন প্রবাদটী যে সম্পূর্ণ সত্য ও সারবান্, ক্রোশাসের জীবনই তাহার প্রধান সাক্ষ্যস্থল।*

স্বার্থপরতা।

পরের কর্ম্ম বা উপকার না করিলে তদ্বিনিময়ে কিছুই লাভ হয় না। অতএব স্বার্থপর ব্যক্তি লাভের নিমিত্ত যে পরের কর্ম্ম বা উপকার করে না, একথা বলা যাইতে পারে না। সেইজন্য উপকার বা কর্ম্ম করিলে অর্থ বা কর্ম্ম প্রত্যুপকার পাইব, এভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহার মূলে স্বার্থ নিহিত আছে। সুতরাং স্বার্থপর লোক, বিনিময়ে কিছু প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, পরের কর্ম্ম বা উপকার করিতে স্বীকৃত হয় না।

স্বার্থপর ব্যক্তিরা কিন্তু নিতান্ত অদূরদর্শী হয়। তাহারা নিজের কিংবা পুত্রকলত্রের নিমিত্ত বর্ত্তমানে যাহাতে ভাল হয় বা লাভ

---

* "প্রবন্ধ পাঠ।"

পাওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করে, এবং এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহারা স্বার্থ ব্যতীত অন্যান্য সমগ্রবিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়। তাহারা একবার স্বার্থপর বলিয়া পরিগণিত হইলে, অপরাপর ব্যক্তির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয়। তাহারা কোন প্রকারে চিন্তা করিতে পারে না যে, বর্ত্তমানে প্রত্যুপকার না পাইলেও কোন দিন অসময়ে উপকার পাইতে পারে, অথবা উপকার করিয়া প্রত্যুপকার না পাইলেও একদিনের জন্য মানব-জীবন সার্থক করিতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তিগুলি স্বার্থের প্ররোচনায় এইরূপে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের কোমলতর স্থান হইতে বিতাড়িত হওয়ায় স্বার্থপর ব্যক্তি, পদগৌরবে মত্ত হইয়া বিবেচনা করে যে, তাহার অধীন লোক অথবা উমেদারেরা, তাহাকে বিপদে আপদে সাহায্য করিবে, এবং তাহারা উপকার করিলে প্রত্যুপকার করিবারও আবশ্যক হইবে না। স্বার্থপর ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলে সে ব্যক্তি মনে করে, নিশ্চয়ই ইহার মূলে স্বার্থ নিহিত আছে, নচেৎ পরার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া লোকে কেন তাহার উপকার করিবে? স্বার্থপর লোক ভদ্রতা বুঝিতে পারে না। নিজের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মন্দ অবস্থার আত্মীয়ের বাটীতে নানাবিধ খাদ্য খাইয়া ও আদর আপ্যায়ন পাইয়া তাহারা মনে করে, "বোধহয় কোন স্বার্থ আছে, নচেৎ এব্যক্তি কেন এরূপ যত্ন করিবে," অথবা তাহার অবস্থা উন্নত সেই নিমিত্ত বোধ হয় কোন সময়ে উপকার পাইবে, এই ভাবিয়া সে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছে। তাহারা এমনই ইতর যে, সেই আত্মীয় তাহার বাটীতে আসিলে, পূর্ব্বোক্ত কল্পিত কারণে প্রত্যুপকার করিতে হইবে ভাবিয়া, তাহাকে সেরূপ অভ্যর্থনা ত করেই না, পরন্তু তাহাকে যাহা কিছু খাতির করে তাহাও যেন "সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা" দান করিতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। হা ধিক্। স্বার্থপরের ভদ্রতাও স্বতন্ত্র। অনেক সময় ভদ্র-

তার হিসাবে যাঁহারা, "আমার বাটীতে তিনি আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা করা উচিত" এই ভাবিয়া স্বার্থপর ব্যক্তির বাটীতে যদি কেহ দেখা করিতে আইসেন, তাহাতেও ভিন্ন অভিমত আছে অনুমান করিয়া স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না। ইহারা যে কেবল ব্যয় করিয়া আতিথেয়তা প্রত্যর্পণ করিতে কাতর এরূপ নহে, চক্ষু থাকিতে ইহারা চক্ষুহীন, অভদ্র, ঘৃণিত। ইহাদের ছায়া স্পর্শনেও দোষ। কি লজ্জা ও ক্ষোভের কথা। স্বার্থপরতা হইতে অর্থগৃধ্নুতা, ভদ্রতার অভাব, প্রত্যুপকারে কাতরতা এবং হৃদয়ের নীচতা। তাহাদের মতে অর্থই যখন সকল সুখ ক্রয় করিতে পারে এবং সকল দুঃখ অপনোদন করিতে পারে, তখন জগতের, সমাজের, আত্মীয়ের ভাল মন্দে উদাসীন হইয়া যে কোন উপায়ে কেবল অর্থ উপার্জ্জন অথবা স্বকীয় বৃত্তিগত অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে জগতে সুখী হওয়া যাইবে। এ জাতীয় লোক ক্রমে ক্রমে নিজ সংসারের পরিজন ও পোষ্যবর্গ হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে, এবং নিজ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, এমন কি শেষে নিজ জন্মদাতার বা গর্ভধারিণীর ক্লেশ, যাহা অর্থ বা সামর্থ্য বা দুইটি মুখের কথাতেও অপনোদিত হইতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টাকরাও স্বার্থোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া তাহারা বিবেচনা করিতে থাকে। তাহাদের ইচ্ছা হয়, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে পৃথক ভাবে থাকিয়া আত্মোন্নতির পথ অনুসন্ধান করে। কিন্তু এই অদূরদর্শী ব্যক্তিরা একবারও ভাবে না যে, তাহার অকালে মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী বা অপোগণ্ড পুত্র কন্যার জন্য আন্তরিক কাতরতা প্রদর্শনের নিমিত্ত, তিনি কাহাকেও রাখিয়া গেলেন কি না। অধিকন্তু তিনি একবারও মনে করিলেন না যে, তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহারই হীনপ্রভাব মুগ্ধ, তাঁহার নিজপুত্র, অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেই, নিজ গর্ভধারিণীর কিংবা ভ্রাতা ভগিনীর কষ্ট অপোনদনের নিমিত্ত

তিলার্দ্ধও চিন্তান্বিত হইবে না। সজ্জিত গৃহের, হাল ফ্যাসনের পোষাক পরিচ্ছদের, খাট, পালঙ্ক, চিকুর ইত্যাদির, নিত্য নব অভাব পূরণের নিমিত্ত তাহাদের এতই অর্থের আবশ্যক হয় যে, নিতান্ত নিকট আত্মীয়কে দুই পাঁচ টাকা দেওয়া অতিশয় ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়।

এই স্বার্থপর ব্যক্তি, সকল বিষয়ে হিসাব করিয়া কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে এবং সেই কারণে সদ্বৃত্তি প্রণোদিত কোন কর্ম্মে নিজ স্বার্থের কিছুই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। যাহার দ্বারা মাতা পিতার, ভ্রাতা ভগিনীর, নিকট-আত্মীয়, কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীর উপকার সাধিত হয় না, তাহার দ্বারা অপরের বা দেশের কোন উপকারই সাধিত হয় না। তাহার কোন কর্ম্মই অপরের মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া অনুমিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার সকল অনুষ্ঠানই স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, অথবা তাহার কোন কর্ম্মে যোগদান করিতে সম্মত হয় না।

আমাদের দেশের লোক আজিকালি অতিশয় স্বার্থপর হইয়াছে। সকলেই যদি নিজের লইয়া সকল সময়ই সবিশেষ আগ্রহান্বিত হয়, তাহা হইলে সমগ্রের জন্য কে চেষ্টা করিবে? আমাদের এই নিমিত্ত এমনই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সাধারণের ও সমগ্রের নিমিত্ত যেন রাজাকেই সকল বিষয়ে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এবং যদি কেহ লাট সভায়, নিজে কোন অনুষ্ঠানে যোগদান না করিয়াও সভ্যরূপে কেবল কথায় কোন উপকারের নিমিত্ত আগ্রহ দেখান, তাহা হইলেই বুঝি যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিলেন। আজ কয়পুরুষ হইতে আমরা নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া অদূরদর্শী হইয়াছি। যদি আমরা প্রত্যেকে স্বার্থশূন্য হইয়া দূরদর্শী হইতাম, তাহাহইলে এক এক ব্যক্তির কার্য্য পরম্পরার ফলসমষ্টি দ্বারা গঠিত সমাজ ও দূরদর্শী হইত, এবং তাহা হইলে যে অন্নকষ্টের নিমিত্ত আমরা আজ

হাহাকার করিতেছি, উহা প্রতি গৃহে, ক্রমে প্রতি সংসারে, ক্রমে প্রতি সমাজে, ক্রমে সমগ্র দেশে বোধহয় অনুভূত হইত না। স্বার্থপরতার বিষময় ফল অদূরদর্শিতা, অভদ্রতা ও অনভিজ্ঞতা।

বাণিজ্য।

বাণিজ্য বলিলে বণিকের বৃত্তি বুঝায়, এবং একদেশের প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত উৎপন্ন ও প্রস্তুত সামগ্রী, অন্যদেশে বিক্রয় করা বণিকের বৃত্তি। যে দেশে, যে সময়ে, যে সামগ্রীর, যেরূপ অভাব অনুভূত হয়, বণিকেরা সেই দেশে, সেই সময়ে, সেই সামগ্রী বিক্রয় করিতে থাকেন বলিয়া লাভবান্ হয়েন। অতএব প্রথমে মনে হয়, অভাব-নিবারণ করাই বাণিজ্যের মূল উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে এই স্বার্থপর জগতে স্বার্থ না থাকিলে বণিক্ অভাব মোচনে অগ্রসর হয়েন না। বাণিজ্য রূপ কষ্টি পাথরের দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করা উচিত কি না, অর্থাৎ উহা উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিলে মূল্যবান্ পণ্য বলিয়া বিক্রয়-যোগ্য বিবেচিত হইবে কিনা, ইহা স্থির হইলে, লোকে ঐ সকল সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অতএব এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বাণিজ্যের দ্বারা জগতের অভাব মোচন হয়। এ কারণে যেমন ক্রেতারা, সেইরূপ উৎপাদক ও প্রস্তুতিকারকেরাও, বণিকের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে যদি সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে হইত এবং আপন আপন পণ্যের ক্রেতা অনুসন্ধান করিতে হইত, তাহা হইলে জগতে এত অধিক সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইত না। নিজেদের ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকে তাহারই সহিত অন্যদেশের অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপযোগী সামগ্রীর

বিনিময় হইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, বাণিজ্যে ধনের বিনিময়ে ধন পাওয়া যায়, এবং নূতন ধনের উৎপত্তি বাণিজ্যে সম্ভবপর নহে বলিয়া বাণিজ্য ধনপ্রসূ নহে। *কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এক বাণিজ্য সাহায্যে ব্যক্তি বা দেশ বিশেষের প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর বিনিময় হইয়া থাকে। যদি বাণিজ্য না থাকিত, তাহা হইলে প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে না পারিয়া, ব্যক্তি বা দেশ বিশেষ, হয়—যে সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করে তাহা ভিন্ন অন্য নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করিতে বঞ্চিত হইত, না হয়,—অসভ্য জাতির ন্যায় সামগ্রী ভোগের আকাঙ্ক্ষাও তাহাদের মনে বলবতী হইত না। মূল্যবান্ সামগ্রী না থাকিলে তাহার বিনিময়ে মূল্যবান্ সামগ্রী প্রাপ্তি বা বাণিজ্য সম্ভবপর হয় না এবং বাণিজ্য ব্যতিরেকেও বিনিময় কার্য্যও চলিতে পারে না। অতএব দেশ বিশেষের ধনবৃদ্ধি না হইলে তদ্বিনিময়ে অধিক ধন পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের মত দেশ বাণিজ্য দ্বারা অধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দেশে কোন না কোন ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণ উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, নচেৎ কোন্ ধন সামগ্রীর বিনিময় করিয়া তাহারা অন্য ধন সামগ্রীতে দেশ পরিপূর্ণ করিতেছে?

কেবল জীবনধারণোপযোগী সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলে উপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হয় না। যাহারা নানাবিধ সামগ্রী ভোগের বাসনা পোষণ করে, তাহারাই ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত করে, অথবা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

বাণিজ্যের সাহায্যে দ্রব্য সামগ্রী স্থানজনিত মূল্যের উপর নির্ভর না করিয়া যথায় অধিক মূল্য পাওয়া যায়, তথায় আনীত হইয়া অধিক মূল্যযুক্ত হইতেছে ও সেই পরিমাণে কেবল উৎপাদক ও নির্ম্মাতার আয়

বৃদ্ধি করিতে করিতে ঐ সকল সামগ্রীর বিনিময়-ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত আছে তাহাদিগকেও ও ধনী করিতেছে। কেবল যে তাহাদিগকে ধনী করিতেছে এরূপ নহে, অনেক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে যাহারা ক্রয় করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে অন্ন দিয়াছে ও যাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ তাহাদিগকেও চাঁদার অর্থে অন্ন প্রদান করিয়াছে।* অবশ্য, বাণিজ্য ব্যাপারে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, বিনিময়-সম্ভূত ব্যাপারে কিছু না পাইলে কিছুই দেওয়া হয় না কিন্তু, কিছু দিয়াও অনেক সময় কিছু পাওয়া যায় না।

অর্থের বিনিময়ে আমরা অন্য সামগ্রী লাভ করিয়া থাকি বলিয়া অনেকের মনে ধারণা যে সামগ্রী ক্রয় করিলে অর্থনাশ হয়। কিন্তু সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আমরা অর্থ দিয়া থাকি, একথা অনেকেই ভুলিয়া যান। আমরা ত অর্থ অনায়াসে পাই না, হয় মানসিক, না হয় কায়িক পরিশ্রম করিয়া আমরা অর্থ পাই। আমরা যদি বলি যে, কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে অর্থ না লইয়া, চাউল, ডাইল, ঘৃত, বস্ত্র, ইন্ধন, লবণ ইত্যাদি লইব, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কায়িক বা, মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা এগুলি লাভ করিব। সেই কারণে বলা যাইতে পারে যে, কায়িক পরিশ্রমের বলে আমরা যে সকল সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করি, অথবা মানসিক পরিশ্রমের বলে আমরা যেরূপ অর্থ বা অন্য দ্রব্য পাইবার অধিকার লাভ করি, তাহারই বিনিময়ে আমরা স্বদেশ বা বিদেশ জাত সামগ্রী লাভ করিবার শক্তি লাভ করি। অতএব আমরা যদি পূর্ব্বাপেক্ষা বিদেশ হইতে অধিক সামগ্রী আমদানী করি, অথবা স্বদেশ হইতে অধিক সামগ্রী রপ্তানি করি,

---

* দুর্ভিক্ষের সময় বণিকেরা অনেক টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আমাদের অধিক হইয়াছে।

বাণিজ্য ব্যাপারে কোন অন্যায় অনুরোধ বা বল প্রদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহারও কোন সামগ্রী লইবার ইচ্ছা না থাকিলে কেহ তাহাকে বল প্রয়োগ করিতে পারে না। অধিকন্তু সামগ্রী বিক্রয় করিবার অভিলাষে সকল দেশের লোকই ব্যস্ত, এমন কি একদেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয়।

দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এক দেশের অর্থ অপর কোন দেশ বিশেষের লোক লইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর, একথা বাতুল ব্যতীত কেহই স্বীকার করিবে না। যে ব্যক্তি ক্রয় করে, তাহার অর্থ না থাকিলে সে ক্রয় করিতে পারে না, এবং প্রকারান্তরে সে নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করে। যদি কোন দেশের সকল ব্যক্তিই পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত বা উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য দেশের স্যামগ্রী গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অন্য দেশের যেরূপ সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, অথবা সামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ প্রথমোক্ত দেশেরও সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে অথবা সামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এ জগতে সামগ্রীর বিনিময়েই সামগ্রী গৃহীত হইতেছে, অর্থ কেবল বিনিময় কার্য্য সুকর করিয়া দিতেছে। এ কারণে কোন দেশের অর্থ কোন দেশে চলিয়া যাইতেছে না। অধিকন্তু আমার দেশের অর্থ অন্য দেশে চলিয়া যাইবে কেন? এবং এরূপ কোন মূর্খ দেশ আছে যে, জাহাজ ভাড়া দিয়া এক দেশের অর্থ অন্য দেশে পাঠাইবে? সুতরাং এক দেশের নিকট যে প্রাপ্য অর্থ থাকে তাহারই বিনিময়ে সেই দেশের অন্য সামগ্রী ক্রীত হইয়া ক্রেতার দেশে চলিয়া যায়। এখন কোন সামগ্রীর বিনিময়ে কোন দেশের কোন

সামগ্রী ক্রয় করা উচিত, একথা লইয়া অনেক গ্রন্থকার গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু একথা কখনই বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ইহা ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।*

আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, বাণিজ্য সাহায্যে যেরূপ অর্থ প্রাপ্তি হইতে পারে অন্য কোন বৃত্তিসূত্রে সেরূপ অর্থ প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। আমরা প্রথমে অন্তর্বিনিময়ে সামান্য ব্যবসায়ের সহিত কুসীদ বৃত্তির তুলনা করিব। যাহার ৫০৲ টাকা মূলধন আছে, তিনি বার টাকা সুদে ধার দিয়া বৎসরে ৬ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দেখাইব যে ৫০৲ টাকা মূলধনের অধিকারী বৎসরে ৪৮০৲ টাকা লাভ করিতে পারেন। মনে কর, বৈদ্যবাটীর হাটে প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা লইয়া দুইজন তরিতরকারী ক্রয় করিতে গিয়াছে। তাহারা উভয়ে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া ১০০৲ টাকার তরকারী ক্রয় করিয়া পোস্তার হাটে কোন আরিয়ৎদারের নিকট পঁহুছিয়া দিল। দুইদিন পরেই তাহারা আড়িয়ৎদারী (commission) দিয়া প্রত্যেকে অতিকম ৫৲ টাকা করিয়া লাভ করিলেও এইরূপে মাসে ৮ বার কারবার করিয়া তাহারা প্রতিমাসে ৪০৲ টাকা করিয়া লাভ করিল এবং বৎসরের শেষে ৫০৲ টাকা মূলধনে ৪৮০৲ টাকা পাইল। এ দিকে আমাদের কুসীদজীবী ১২৲ টাকা সুদে টাকা খাটাইয়া সমস্ত বৎসরে ছয় টাকা মাত্র পাইল।

এইরূপে আমরা দেখাইতে পারি যে যাহার ৫০০৲ টাকা মূলধন আছে সে ব্যক্তি বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া পাটের বা চাউলের মৌসুমের সময় অথবা নব রবিশস্য আমদানীর (নয়ালির) সময়, ক্রয় করিবার স্থানে লোক নিযুক্ত করিয়া এবং বিক্রয় স্থলে উপস্থিত থাকিয়া, প্রতিদিনের

---

* কোন কোন গ্রন্থকার এ বিষয়ে অবান্তর কথা লিখিয়াছেন বলিয়া এই বিষয় আলোচিত হইল। পরীক্ষার্থী এ বিষয় যত অল্প আলোচনা করিবে, ততই মঙ্গল।

বাজার দর অবগত হইয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত মাল আনয়ন করিতে পারে; এবং আড়িয়ৎদারের নিকট উহা পঁহুছিয়া সামগ্রী বাবৎ অগ্রিম অর্থ লইয়া বারংবার নিজ মূলধনের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে ৭০০।৮০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে।

এই অন্তর্বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যখন চতুর ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্য গ্রহণ করে, তখন দশ সহস্র মুদ্রায় তাহারা লক্ষাধিক মুদ্রার ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় ও কমলার কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে বৈশ্যদের মধ্যে কেহ কৃষি, কেহ পশুপালন, ও কেহ বাণিজ্য করিত। বাণিজ্য জাতিগত বিদ্যার অন্তর্গত ছিল বলিয়া পিতার নিকট পুত্রের শিক্ষালাভ হইত। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বণিকের পুত্রই বণিকের কর্ম্মে অনেকাংশে সফলকাম হয়েন। অতএব বাণিজ্য কার্য্য যে শিক্ষা সাপেক্ষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বঙ্গদেশের অনেকের ধারণা যে, কেবল মূলধন থাকিলেই ব্যবসায় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইতে পারে এবং শিক্ষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তাহারা একবারও ভাবেন না যে বাজার সম্ভ্রম বণিকের মূলধনের দশগুণ অধিক কার্য্যকরী এবং বাজার সম্ভ্রম লাভ করিতে হইলে, চরিত্রবান্ ও ন্যায়বান্ হইতে হয়, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা পালন করিতে হয়, বাজার দর অপেক্ষা অধিক দর লইতে নাই, দ্রব্য পরিমাণে অল্প দিয়া অধিক বলিতে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহারা ভুলিয়া যান যে, ব্যবসায়-বুদ্ধির বিস্তার সাধন করিতে বণিকের নিকট শিক্ষানবিশী করিতে হয়, অথবা বাণিজ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়। তাহারা একবারও ভাবেন না যে, ধনী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি ব্যয়সংযম করিয়া মাসিক ৫৲ টাকাও সঞ্চয় করিতে পারেন,

তাহারা ঐ অর্থে কোম্পানীর অংশের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারেন এবং তাহার নামে যখন অংশ বিলি হইবে, তাহার পর হইতে তিন মাস অন্তর ১৫।২০৲ টাকা দিয়া অথবা ৬মাস অন্তর৩০।৪০৲ টাকা দিয়া ক্রমশঃ একটী ব্যবসায়ের একখানি অংশের সম্পূর্ণ মালিক হইতে পারেন। এই রূপে যাহাদের মূলধন অল্প এবং যাহারা নিজে ব্যবসায় পরিচালন করিতে অসমর্থ, তাহাদের ন্যায় কতশত লোকের মূলধন লইয়া সম্ভূয়সমুত্থানে দেশের বাণিজ্য কার্য্য বিস্তৃত হইয়া তথাকার ধনোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথচ এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতারা বাণিজ্য শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই অধিক লোকের অল্প মূলধনে বিস্তৃত বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ধন্য সেই দেশ যাহার অধিবাসিবৃন্দ কেবল অনর্থকরী বিদ্যার শিক্ষালাভ না করিয়া বাণিজ্য শিক্ষাতেও মনোনিবেশ করিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প।

এ জগতে আহারের জন্য নানাবিধ শস্য, তরি তরকারী, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি, অঙ্গরক্ষার জন্য তুলা, ঊর্ণা, রেসমের বস্ত্র ইত্যাদি, আশ্রয়ের জন্য ঘর, বাটী ইত্যাদি এবং সখের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রীর আবশ্যক। আমরা কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি ধনীর গৃহে বা বাহিরে যে সকল সামগ্রী দেখিতে পাই, ঐগুলি ভূগর্ভ বা নদীগর্ভ অথবা সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরে কর্ম্মফলা বুদ্ধি, মূলধন ও পরিশ্রমের সাহায্যে নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের অভাব মোচন করে। ভূমিকর্ষণ করিয়া উহা হইতে সামগ্রী উৎপাদন করা কৃষকের কর্ম্ম, এবং কৃষকের কর্ম্মকেই কৃষি কহে। আজি কালি, ঘৃত দুগ্ধ নবনীত অথবা রেশম পশম ইত্যাদি উৎপাদনের নিমিত্ত পশু ও গুটিপোকা পালনও

কৃষির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শিল্প বলিলে নিপুণতার সহিত বস্তু নির্ম্মাণাদি কর্ম্মকলা বুঝায়। উৎপন্ন সামগ্রীতে নিপুণতার সহিত কর্ম্ম করিলে শিল্পকর্ম্ম করা হয়। এই কারণে শিল্প কৃষি সাপেক্ষ এবং কৃষিজাত সামগ্রীও শিল্পজাত সামগ্রীর প্রাচুর্য্য না হইলে বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয় না। অতএব বাণিজ্য উভয় সাপেক্ষ, এবং যেহেতু বাণিজ্যের বিস্তৃতির সহিত দেশের সমৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেইহেতু যে দেশে কৃষি বা শিল্পের বা উভয়ের উন্নতি সাধিত হয় নাই, সে দেশ সভ্য জগতে দরিদ্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কৃষি অপেক্ষা শিল্পে অধিক লাভ এবং বাণিজ্যে লোকসানের সম্ভাবনা অল্প। এক মণ তুলা উৎপন্ন করিতে কত বাধা কত বিঘ্ন, হয়ত অতি বৃষ্টিতে অথবা কীট দংশনে তুলার গাছ নষ্ট হইয়া গেল, না হয়, বিনা বর্ষণে ঐ গুলি শুষ্ক হইয়া গেল, কিন্তু একমণ তুলা উৎপন্ন হইলে পর, শিল্পী উহাতে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া যে পরিমাণ সূত্র নির্ম্মাণ করিল, অথবা তাহার নিকট কি হস্তশিল্পী, কি যন্ত্রশিল্পী, উহা ক্রয় করিয়া যে কয়খানি বস্ত্র নির্ম্মাণ করিল, ইহাদের মূল্যের পার্থক্য দেখিলে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। শস্য অজন্মা হইলে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট খরিদ করিয়া লাভে অপরকে বিক্রয় করিলে বণিকের ক্ষতি হয় না। বণিকগণ এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে জাতিগত পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও প্রস্তুত করে, তাহাদের নিকট খরিদ করিয়া যাহাদের নিকট লাভ পায়, তাহাদেরনিকট বিক্রয় করে। কোন প্রস্তুতি-কারকের ক্ষতি হইলেও বণিকের ক্ষতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈশ্যদের কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিন বৃত্তির মধ্যে বণিকের বৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। সুতরাং বাণিজ্যিক হিসাবে বলা যাইতে পারে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।"

কৃষকের কিন্তু দুর্ভিক্ষ ক্লেশ বড় একটা অনুভব কবিতে হয় না ; কারণ "সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যম্।" কিন্তু অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকাব ঘটনাব উপব কৃষিকর্ম্ম নির্ভর কবে বলিয়া ক্ষুন্নিবারণ ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য অভাব বড একটা পূরণ হইতে দেখা যায় না। এ কাবণে বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশের কৃষকদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে, "কচিত্তুষ্টাঃ কৃষীবলাঃ (কৃষকেরা)।" কিন্তু আজি কালি, কি আমেরিকা, কি ইউরোপ, কোথাও ত কৃষকেব এরূপ দবিদ্র অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ যে, সহস্র সহস্র বৎসব পূর্ব্বে যে উপায়ে এ দেশে কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ উৎপাদিত হইত, আজিও সেই উপায় এদেশে অবলম্বিত হইতেছে। বিজ্ঞানেব দীপ্ত আলোকে নানাবিধ শ্রমসংক্ষেপেব কৃষিযন্ত্র সৃষ্টি হইলেও এদেশীয় স্থিতিশীল ও দরিদ্র কৃষক তৎসমুদয়ের সাহায্য লইতে অগ্রসব হইতে পারিতেছে না। এই সুবিপুল ভাবত সাম্রাজ্যে এখন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে একজনে চাষবাস কবিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনে প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমি চাষ আবাদ করিতে পারে, বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড বা হলণ্ডের মত অল্পজমি হইতে অধিক শস্য বা তবিতরকারী উৎপন্ন কবিতে পারে। অধিকন্তু শ্রম বিভাগ প্রথায় পরস্পর পবস্পরের সাহায্য করিয়া সেই ক্ষেত্র হইতে অধিক ফসল পাইতে পাবে। শ্রমবিভাগ করিয়া লইলে যে অধিক সামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন কথা নহে। মনে কর, একটি বৃদ্ধ কৃষক ও একটি যুবা কৃষক চাষ করিতেছে। বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রেব মূলা তত লম্বা হয় না, তবে সে জমি ভাল করিয়া পাট কবে ও নিড়ায় বলিয়া তাহার মূলা মোটা হয় এবং মোটের উপর বিঘাপ্রতি একশত মণ জন্মায়।

এদিকে যুবা কৃষক গভীর করিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু তাহার হাত চঞ্চল, সেইকারণে ভালরূপ নিড়াইতে পারে না বলিয়া অনেক কচি মূলা নষ্ট করে ও ক্ষেত্রে তৃণ থাকিয়া যায়। সে কারণে তাহার মূলা লম্বা হয় বটে, কিন্তু মোটা হয় না ও মোটের উপর বিঘা প্রতি একশত মণ হয়। এস্থলে যদি উহারা একত্র হইয়া শ্রমবিভাগ পূর্ব্বক কার্য্য করে অর্থাৎ অতিরিক্ত মজুর নিযুক্ত না করিয়া যুবা যদি উভয় ক্ষেত্রই কর্ষণ করে ও বৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্র পাট করিয়া নিড়ায়, তাহা হইলে মূলাগুলি মোটা ও লম্বা হইবে এবং বিঘা প্রতি দেড়শত মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিধি অবলম্বিত হয় না বলিয়া এবং পূর্ব্বেকার জমী অনেকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় কৃষকের অবস্থা দিন দিন হীন হইতেছে। অধিক জমির খাজনা দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই এবং উন্নত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করিবার উপযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্তু পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তারা কোন স্থানে সস্তায় অধিক ভূমি লইয়া উন্নত-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বুদ্ধি কৌশলে দশ গুণ কর্ম্ম করিয়া সেই পরিমাণে উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণ জমী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার, এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাঙ্গলায় সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এত আন্দোলন, সুখের বিষয় সেই বাঙ্গালায় জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত জমিগুলি সস্তায় বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ভাগাড়ের অস্থিগুলি বাহির হইয়া যাইতে না দেন, তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, দুই তিন জন

জমীদার মিলিয়া কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ নিজ নিজ মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও মূলধন অল্প সুদে পাইয়া ব্যবহার করিতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজাদের বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দিতে অনুরোধ করিলে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী হইতে তাহারা অল্প সুদে ধার পাইতে পারে। জমীদারগণ নিজে অথবা পুষা কৃষি কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের সাহায্যে যদি প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মভীরুর ন্যায় কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়।

শিল্প কৃষিসাপেক্ষ হইলেও আমরা বলিয়াছি শিল্পে অধিক লাভ। একারণে শিল্পজাত সামগ্রী অধিক প্রস্তুত করিয়া কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় করিতে অসুবিধা হয় না। অতএব যদিও নিজদেশে খরচ অধিক পড়ে বলিয়া ইংলণ্ড অতি সামান্য শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি জগতের অন্যান্য দেশ হইতে তূলা ও নিজ দেশের খনি হইতে উৎপন্ন লৌহের দ্বারা যে পরিমাণ লৌহশিল্পের ও বয়নশিল্পের উন্নতি করিয়াছে, তাহারই ফলে অল্পব্যয়ে প্রস্তুত অধিক সামগ্রীর বিনিময়ে, এবং নিজদেশে প্রস্তুত বহুবিধ অর্ণবপোতে অপর দেশের মাল বহন করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহারই বিনিময়ে জগতের নানাদেশের উৎপন্ন খাদ্য সামগ্রী ও কাঁচামাল এবং প্রস্তুত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া নিজেদের অভাব মোচন করিতেছে।

ভারতবর্ষ কেবল আজি কালি কৃষি-প্রধান-দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হস্তশিল্পে ভারতবর্ষীয়েরা আজিও জগতে অদ্বিতীয় হইলেও, কর্ম্মকর্ত্তা, শিক্ষক, মূলধন ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বিরহিত বলিয়া তাহারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যে উপায়ে শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিত, আজিও সেই উপায় অবলম্বন করিতেছে এবং শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রাদি সৃষ্ট হইলেও,

পূর্ব্বোক্ত কারণে তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য-জাতি-নিবহ বিজ্ঞানবলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও বিলাস-দ্রব্য অল্পব্যয়ে, অথবা আপেক্ষিক লাভের তারতম্যে প্রস্তুত করিয়া এ দেশীয় শিল্পীকে পরাস্ত করিয়াছে। এদেশে সহজেই অর্থ ঋণ দিয়া শতকরা বার টাকা সুদ পাওয়া যায়। অতএব যে ব্যবসায়ে ঐরূপ সুদ বাদে কিঞ্চিৎ অধিক লাভ না পাওয়া যায়, তাহাতে এদেশীয় ধনীর অর্থ আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে, কারণ, এজগতে সকলেই নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে। একারণে বলা যাইতে পারে যে, এদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী যাহার ব্যবসায়ে পূর্ব্ব হইতেই বার টাকা লাভ পাওয়া যাইত এবং যাহার অনুষ্ঠান করিতে অপর দেশ নানা কারণে পশ্চাৎপদ, সেই জাতীয় শিল্পের অনুষ্ঠান ও সাহায্য করিয়া যে দিন ভারতবাসীর অধিকাংশ লোকের ধনবৃদ্ধি হইবে, সেই দিন সুদের হার কমিবে। সকলেই অল্পসুদে অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ অব্যবহৃত সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া যাহা এ দেশে পূর্ব্বে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারিত না, তাহারই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় কোম্পানী বা সম্ভূয়-সমুত্থানে অর্থ সংগৃহীত করিয়া দেশের শিল্পোন্নতির সাহায্য করিবে। ইহাই বাণিজ্যিক ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সূক্ষ্ম হস্তশিল্পে প্রস্তুতি-ব্যয় অধিক পড়ে বলিয়া উহার মূল্যও অধিক হয়। একারণে নিতান্ত ধনী ব্যতীত অন্য কেহ উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু ঢাকার মসলিন, কি ত্রিপুরার শীতলপাটী, কি কাশ্মীরের শাল, কি কটকের রূপার সামগ্রী, কি মির্জ্জাপুরের গালিচা ইত্যাদি সূক্ষ্ম শিল্পজাত বিলাস সামগ্রী অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া এক পুরুষের ভোগেও নষ্ট হয় না। একারণে এ জাতীয় শিল্পে এদেশীয় লোকের অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে না। বাণিজ্যে যে শিল্পের পরিপোষণ হইতে পারে, আজি কালিকার

জীবনযাত্রার জটিল সমস্যার দিনে সেই শিল্পেরই আদর হইবে। শ্রম-সংক্ষেপের যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যয় সংক্ষেপে প্রস্তুত সামগ্রী প্রতিযোগিতায় স্থিতিলাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে যে শিল্পাগারের কথা শুনা যায়, সেইরূপ ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় যত অধিক স্থাপিত হইবে, এবং সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া এদেশীয় লোক নানাবিধ বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা শিল্পে যত অধিক প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিবে, ততই তাহারা পুরাতন শিল্পকে নূতনের উপযোগী করিবে এবং নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধির সাহায্যে কতকগুলি শিল্পে একাধিপত্য করিতে পারিবে। যে দেশে যে সামগ্রীর যে সময় অধিক অভাব অনুভূত হয় না, সে দেশে সে সামগ্রীর সে সময় কাটতি হয় না। এবং যে সামগ্রীর কাট্‌তি অল্প, তাহাতে যতই শ্রম নিয়োগ করা যাউক না কেন, শ্রমের অনুপাতে তাহার মূল্যধার্য্য হয় না। অতএব শিল্প ও বাণিজ্য এই উভয় বিষয় একত্র বিচার করা উচিত। বাণিজ্যের বশেই অন্যান্য দেশের শিল্পের গতি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সচরাচর আমরা যে সমস্ত গৃহপালিত জন্তু দেখিতে পাই, তন্মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদ্ আহার করে, যেমন গাভী, মহিষ, মেষ, ছাগ, অশ্ব, ইত্যাদি, এবং কতকগুলি মৎস্য, মাংস ও উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করে, যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীবেরা শ্বাপদ বা হিংস্রক শ্রেণীর জন্তু হইলেও উদ্ভিদ্-জীবীর মত নিতান্ত নিরীহ, কৃতজ্ঞ ও সংসর্গপ্রিয় বলিয়া সর্ব্বদাই মানব জাতির উপকার সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে।

অসভ্য অবস্থা হইতে আশ্রয়যুক্ত হইতে, কিংবা প্রত্যহ আহারের নিশ্চিত প্রাপ্তিতে, অথবা বল্কল পরিধান না করিয়া ঊর্ণা জাত সামগ্রী

পরিধান করিতে, প্রকৃতি জাত ভূমি ও মনুষ্যের পরিশ্রম, এবং কর্ম্মকলা বুদ্ধি যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, গৃহপালিত পশুরাও সেইরূপ সাহায্য করিয়াছে। যাযাবর জাতির মত আমাদিগের আদি-পুরুষদের আদিম কালে প্রত্যহ আহার প্রাপ্তির নিশ্চিততা ছিল না। তাহারা কোন দিন বৃক্ষের ফল সংগ্রহ করিয়া, কোন দিন অনশনে থাকিয়া, কোনদিন জীবহিংসা করিয়া, জীবনাতিপাত করিতেন এবং আশ্রয় ছিল না বলিয়া শীতের সময় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অবস্থান করিতেন, এবং বর্ষার সময় পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইতেন। বন্য পশুকে প্রতিপালন করিতে শিক্ষা করিবার পর হইতে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে মানবজাতি ক্রমিক উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতে সামর্থ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে দিন হইতে ছাগ ও মেষ, গো ও মহিষ, বৃষ ও অশ্ব, মনুষ্যের সাহায্যের উপযুক্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই অরণ্যের মহীরুহ স্থানান্তরিত হইয়া গৃহ নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে, অবসর-যুক্তা স্ত্রীজাতির সাহায্যে ঊর্ণা হইতে বস্ত্র বয়নের প্রারম্ভ হইয়াছে, বর্দ্ধিত গো ও মহিষের পাল যত্নে লালিত পালিত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীর, ও নবনীতে প্রাত্যহিক আহারের কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া দিয়াছে।

পূর্ব্ব হইতেই মানবজাতি যে কেন ঐ সকল পশু-প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, এবং এখনও যে কেন তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, এবিষয়ে কারণ দেখাইতে তৎপর, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে সকলেই অতীব প্রয়োজনীয়।* গৃহপালিত জন্তু হইতে আমরা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত সামগ্রী লাভ করিয়া থাকি, সেইরূপ বন্য জন্তু হইতেও আমরা চর্ম্মজাত সামগ্রী,—যথা পাদুকা, জীন, লাগাম ইত্যাদি এবং অস্থিজাত সামগ্রী যথা ছুরির বাঁট এবং ঊর্ণাজাত সামগ্রী যথা শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হই। গৃহপালিত জন্তু

হইতে কিন্তু আমরা আরও যে কত সামগ্রী ভোগ করিতে সাহায্য প্রাপ্ত হই, তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইলে যুগপৎ হর্ষ, বাৎসল্য, এবং সখ্য ভাবে অভিভূত হইয়া থাকি। ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানব সন্তান গাভী-দুগ্ধ পান করিয়া কান্তি, বল, বুদ্ধি, সমস্তই লাভ করিয়া থাকে, পরে ঘৃত নবনীতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সে গুলিকে প্রাণ-প্রিয় সামগ্রীরূপে অনুমান করিয়া থাকে। হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে বৈদিক কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত, গাভী সাক্ষাৎ ভগবতী রূপে পূজ্যা, এবং আজিও পল্লীর গৃহপত্নীরা স্বয়ং তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। আজিও তাহাদিগকে মনুষ্য পদবীতে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মঙ্গলা, শ্যামা, বুধি, বলিয়া আহ্বান করা হয়। গৃহস্বামীর অবস্থার পরিমাণ সূচনা করিতে হইলে পূর্ব্বকালে গোধনের সংখ্যার দ্বারা উহা নিরূপিত হইত। বিরাট রাজার ষষ্ঠি লক্ষ গাভী ছিল, এবং তখন ঐ গুলি বিশেষ ধন সম্পত্তি রূপে বিবেচিত না হইলে কুরুপুঙ্গবেরা কখনই সে গুলিকে অপহরণ করিতে সচেষ্ট হইতেন না। অথবা অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে ধনী বা স্পর্দ্ধিত বলিয়া বিবেচিত করিতেন না।

আজি কালি কিন্তু গবী গুলি বিশেষ ধন সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হয় না। গাভী প্রতিপালন আর ভদ্রলোকের কর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয় না। এবং সামান্য গৃহস্থের গৃহিণীও গোসেবায় বীতস্পৃহ। অধিকন্তু সহরে থাকায়, অনেক গৃহস্থের ইচ্ছা থাকিলেও স্থান-সংকীর্ণতা, গোচারণের মাঠের অভাব, এবং খইল, ভুষি, বিচালি ইত্যাদির মহার্ঘ্যতা হেতু গাভী পালন সম্ভবপর নহে। তাই আজ সকলেই প্রবঞ্চক গোয়ালার মুখাপেক্ষী। ইহাতে যে অস্বাস্থ্যকর সামগ্রী মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া শরীরের ক্ষতি করা হয় ও অল্পবয়স্ক বালকদিগের জীবন কাল অপরিমিত ভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয় এরূপ নহে, ঘোষ মহাশয়দের ব্যবসায় কার্য্য

সুকর করিতে যে কুনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহারই ফলে দুগ্ধের মূল্য দ্বিগুণ হইতেছে এবং পরে উহা চতুর্গুণ হইবে। অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী গোপের দ্বারা সদ্যঃপ্রসূত যে প্রকারের গাভীগুলি, গোখাদকদের দেশেও বর্দ্ধিত হয় এবং কোটী কোটী ধনোৎপাদন করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলেই সেই প্রকারের গাভীগুলি হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে কসাইদের নিকট বিক্রীত হইয়া ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে যদি ৫০ বৎসরের হিসাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, যে গাভীগুলি বৎস সমেত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি ও তাহার বকনা গুলি যদি জীবিত থাকিতে পাইয়া বৎস প্রসব করিতে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের যে মূল্য হইত, তাহার সমষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের প্রায় সমান হইবে।

মহিষ দুগ্ধ অল্প উপকারী নহে, উষ্ণপ্রধান দেশে মহিষ দধি অতিশয় তৃপ্তিকর ও উপকারী এবং মাহিষ ঘৃত অল্প মূল্যের বলিয়া গাওয়া ঘৃত অপেক্ষা ভারতবর্ষের সকল গৃহস্থ কর্ত্তৃক অনিবার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। গো ও মহিষের প্রতিপালন পদ্ধতির অনেক বিভিন্নতা। মহিষের নিমিত্ত অতিশয় পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না। ইহাদের রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম কিছুই করিতে পারে না। ইহাদের আহারেরও পারিপাট্য আবশ্যক হয় না। ইহাদের নিমিত্ত নিতান্ত বর্ষা ও শীত ব্যতীত বাসস্থানেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহারা কর্দ্দমাক্ত জলে থাকিতেই ভাল বাসে। পক্ষান্তরে গাভী প্রতিপালন করিতে হইলে, তাহাদের নিমিত্ত-বায়ুসঞ্চলনশীল গৃহের আবশ্যক। গৃহের মেজে পাকা না করিলে, বিচালীর ডাবা পরিষ্কৃত না রাখিলে এবং গোয়ালঘরে ধূম না দিলে, গাভীর পীড়া দেখা দেয়।

নিম্ন বঙ্গদেশে মহিষের দুগ্ধ তত রুচিকর ও জীর্ণকর বলিয়া

বিবেচিত হয় না। সেই কারণে সকলেই গো দুগ্ধের জন্য ব্যস্ত। যে গাভী আমাদের মাতৃস্বরূপা, যাহার পবিত্র সুমধুর পুষ্টিকর দুগ্ধ আমরা পান করি, যাহার পুরীষ পর্য্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করিয়া গৃহ মার্জ্জনাদি ও অন্য অশুদ্ধ সামগ্রী ধৌত করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করি, যাহার করীষ পর্য্যন্ত বন্ধন কার্য্যের একটী প্রধান সহায়তা সম্পাদন করে, যাহার বংসের মূত্র নানা রোগের ঔষধ, এবং মৃত্যুর পরও যাহার চর্ম্মে, শৃঙ্গে ও অস্থিতে নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়, এরূপ আবশ্যক জীবের প্রতি দয়া ও যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। গোপালন রাখালের কার্য্য নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনেকের ধারণা গোপালন ইতরের কর্ম্ম। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পালক-পিতার গোপালনে এত মুগ্ধ হইতেন না এবং পূর্ব্বেকার বহু কথায় গোধনের উল্লেখ থাকিত না। ভূমি, পরিশ্রম, ও মূলধন, ধনাগমের প্রধান উপায় এবং পরিশ্রম সংক্ষেপ করিতে পালিত পশু নিতান্ত আবশ্যক। বৃষ বা বলীবর্দ্দ দ্রব্যভার বহন করিতেছে, শকট ও ঘানী টানিতেছে, পশ্চিমের গভীর কূপ হইতে জলোত্তলনে সহায়তা করিতেছে। শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ইহাদিগের উপর পতিত না হইলে, ইহাদের অকাল ধ্বংস নিবারিত না হইলে, এবং ইহারা পীড়িত হইলে ইহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না হইলে, দেশ গাভী, বৃষ ও বলীবর্দ্দ শূন্য হইবে এবং দেশের ধনাগমের পন্থা নিরুদ্ধ হইবে।

এইত গেল গাভী সম্বন্ধে সাধারণ কথা। গাভী, বৃষ ও বলীবর্দ্দ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে, ইহারা বোধশক্তি রহিত নহে। ইহারা বাঁয় ডাঁয় বলিলে যেরূপ বুঝিতে পারে, নাম ধরিয়া ডাকিলে যেরূপ কাছে আসিতে পারে, আঘাত করিলে ও গালি দিলেও সেইরূপ ক্রন্দন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। ইহারা বাৎসল্য ভাবে পূর্ণ। ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইলে মমতা শূন্য হইলে চলিবে না। ইহাদিগকে

মনে মনে ভাল বাসিলে ইহারাও ভালবাসা দেখায় ও কষ্ট দিলে করুণ নয়নে দৃক্‌পাত করে।

পথশ্রম সংক্ষেপ করিতে, অথবা মাল বহন করিতে, অথবা গাড়ী বা লাঙ্গল টানিতে, অশ্বের আবশ্যক হয়। যে জাতীয় অশ্ব অন্যদেশে লাঙ্গল দেয় তাহার মূল্য ও প্রতিপালন-ব্যয় বলীবর্দ্দ অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব গো মহিষের মত ইহারা সকল গৃহে প্রতিপালিত হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তিরা, অথবা সমৃদ্ধ দেশের কৃষিকর্ত্তারা, ইহাদিগকে প্রতিপালন করে। ইহাদিগকে এত নিয়মে প্রতিপালন করা হয় যে, সচরাচর ইহারা ব্যধিগ্রস্ত হয় না, এবং ইহাদের মূল্য অধিক বলিয়া রোগ্রাক্রান্ত হইলেই ইহারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে। যুদ্ধ বিগ্রহে ইহারা অনিবার্য্য। ইহাদিগকে এমনই শিক্ষিত করা হয় যে কামানের গর্জ্জনে ও রণক্ষেত্রের ঝণঝণায় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া কর্ত্তব্য পরায়ণ সৈনিকের মত ইহারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করে। এক একটী অশ্ব আবার এমনই প্রভুপরায়ণ হয় যে, মৃত স্বামীর অঙ্গরক্ষা করিতে অনাহারে বহুকাল দণ্ডায়মান থাকে। কলিকাতায় যখন একবার নকল যুদ্ধ প্রদর্শনী হইয়াছিল তখন, শিক্ষিত অশ্বগুলি আফ্রিদি যোদ্ধাদিগকে গুলি বর্ষণের সময় কখনও উদরের নিম্নে রাখিয়া পলায়ণ করিয়া ছিল, কখনও যোদ্ধার পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহাকে গুলিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আবার কখনও যোদ্ধার কোটীবন্ধন মুখে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল।

গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুপরায়ণ। অন্যান্য দেশে ইহারা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এদেশে যদিও তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া আদর পায় না, এবং প্রভু ও পরে গৃহের বিড়ালের উচ্ছিষ্টের কতকাংশ পাইয়া ধন্য জ্ঞান করে, তথাপি তাহারা

জাতিগত গুণে অন্যদেশের কুকুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহাদিগকে আদর করিলে, শিক্ষা দিলে ও গাত্রমার্জ্জনাদি যত্ন লইলে, ইহারাও অন্য দেশের কুকুরের মত অন্য নানা উপকারে আইসে। যাহা হউক একমুষ্টি উচ্ছিষ্ট ও দিবারাত্র অনাদর ও কখন কখন প্রহার ভোগ করিয়াও ইহারা গৃহস্থের যে উপকার সাধন করে, এদেশী গৃহস্থ সে পরিমাণে তাহার কোন যত্নই লয়েন না। ইহারা গৃহস্থকে বাড়ী প্রত্যাগমন করিতে দেখিলেই লাঙ্গুল চঞ্চল করিতে থাকে, এবং দিবাভাগে একপার্শ্বে নির্ব্বাক হইয়া শুইয়া থাকে ও রাত্রে বন্য পশু ও তস্করকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেই চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, অথবা তাহাদিগের রবে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহারা নিজের বাটীতে সামান্য অধম ভৃত্য হইলেও অন্য বাটীর অপরিচিতের নিকট দ্বারবানের স্বরূপ। এদেশে একটী প্রচলিত ধরণা আছে যে, ইহারা গৃহস্থকে বহুপুত্রের পিতা হইবার নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করে, কারণ তাহা হইলে উচ্ছিষ্ট মুষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। যে পশুকে যত্ন না করিলেও প্রভুর নিমিত্ত মঙ্গল কামনা করে, তাহাকে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। কুকুর প্রভুর অর্থের থলি পাহারা দিতে শকটচক্রে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তথাপি স্থান ত্যাগ করে নাই। প্রভুর সহিত পর্ব্বতারোহণ করিয়া প্রথভ্রান্ত তুষারহত প্রভুর পার্শ্বে কুকুরঅনাহারে কতকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। প্রভুর অবর্ত্তমানে তাহার উদ্যানে প্রোথিত অর্থ অপহৃত হওয়ায়, কুকুর সে সংবাদ প্রভুকে জানাইয়াছে ও তস্করের বাটী দেখাইয়া দিয়াছে। এরূপ বিশ্বস্ত প্রভুপরায়ণ জীব জগতে আর নাই।

বিড়ালকে অতি অল্প লোকেই প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতি সুশ্রী। ইহারা গৃহস্বামীর জন্য যত না

হউক, আহারের নিমিত্ত ইন্দুর মারিয়া প্রকারান্তরে উপকার করে; কিন্তু অপকারও যথেষ্ট করে। ইহারা কুকুরের মত সুবোধ নহে। ও স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থের ভাল মন্দ বিচার করে না। সুবিধা পাইলেই মৎস্য দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া ইহারা গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করে।

পশুপালন-ব্যবসায় হিসাবে মেষ ও ছাগ প্রতিপালিত হয়, কারণ স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া ইহারা পালন কর্ত্তার ধনাগমে সহায়তা করে। তবে সখের নিমিত্ত মৃগের মত কেহ কেহ ইহাদিগকে গৃহে প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের দুগ্ধ অনেক রোগে উপকার সাধন করে।

বঙ্গদেশের ঋতু সকল

এক এক ঋতুর সময়কাল—ফুল ফল—ক্রীড়া-কৌতুক—পূজা পার্ব্বণ—বিকি কিনী—ইত্যাদি।

বঙ্গ দেশ ষড় ঋতুর লীলা নিকেতন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত, এই ছয় ঋতু পরে পরে এদেশে দেখা দেয়, এবং প্রত্যেকটীর আগমনসময়ে নূতন নূতন স্বাভাবিক বৈচিত্র্য অনুভব করা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র আশ্বিন শীতকাল, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত কাল।

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে দেশ যখন শুষ্ক হইয়া যায়, সকলেরই কণ্ঠতালু শীতল বারির নিমিত্ত যখন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, সরোবরের নিম্নতলস্থ জল আতপ তাপে উত্তপ্ত ও অল্প হওয়ায় মৎসগুলি যখন উহার লতা ও মৃণাল কুঞ্জের তলে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রান্তরে শ্যামল সুকোমল তৃণের অভাবে গাভীগুলি যখন বৃক্ষছায়ায়

সতৃষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান থাকে, সংসারের কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনেকেই যখন বাটীর শীতল গৃহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, এবং চিরপরিশ্রমী বাটীর গৃহিণীও যখন বিদ্যালয় হইতে প্রাতে প্রত্যাগত বালক সমূহকে লইয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম অসম্পাদিত রাখিয়া অন্ধকার গৃহে অবস্থান করেন, তখনই মনে হয় গ্রীষ্মকাল আসিয়া দেখা দিয়াছে। সারাদিনের উত্তাপ ক্লেশ সহ্য করিয়া সকলেই যখন সান্ধ্য সমীরণের অপেক্ষা করিতে থাকে, কৃষক যখন কর্ষিত ভূমির নিমিত্ত সতৃষ্ণ নয়নে কেবলই উপর দিকে অনিমেষ লোচনে প্রার্থনা করিতে থাকে, অপহৃতরসা বসুন্ধরা বৃক্ষমূলাদির কাতর তৃষ্ণায় বিগলিতা হইয়া যখন তাহাদিগের নিমিত্ত সঞ্জীবনী সুধাবারি আরাধনা করে এবং যখন “কাল বৈশাখীর” জলদজাল কখনও ঘনীভূত হইয়া বারি বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদের অন্নদায়িনী ভূমির কথঞ্চিত তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং কখনও বা বায়ুপ্রবাহ যখন উহাকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া ধরা বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করে, তখনই মনে হয় গ্রীষ্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এ সময় মৎস নিতান্ত দুর্ম্মূল্য নহে। তরকারির মধ্যে আলু সস্তা। অনেকে এসময় নিমঝোল, এঁচোড়ের তরকারি, গব্য ঘৃত, আমের ঝোল ইত্যাদি খাইয়া শরীর স্নিগ্ধ করে। বৈকালে ফলের মধ্যে পাকা বেল, শশা, তরমুজ, পেঁপে, ডাব ইত্যাদি পাওয়া যায়। আতপসন্তপ্ত পিপাসিতেরা ঐ সকল ফল ভক্ষণ করিয়া সন্তৃপ্তি লাভ করে। যাহাদের বাটী পল্লীগ্রামে তাহারা কি সকালে কি বৈকালে নদী বা বাপীতটে বাঁধান ঘাটে বসিয়া বেল মল্লিকা যুথিকা সঞ্চয় করিয়া দিবা ভাগের ক্লেশ ভুলিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ঠাকুর ঘরে বসিয়া চম্পক, বেল, গন্ধরাজ, চন্দন ইত্যাদিতে প্রস্তুত চরণামৃত মুখে ও মস্তকে গ্রহণ করিয়া মনের সুখে দিনের গরম ভুলিয়া যায়। এ সময়ে নদ নদী, খাল বিল ও পুষ্করিণী দীর্ঘিকা শুষ্কপ্রায় হয়

এবং স্থলপথে বাণিজ্য কার্য্য সমাধা হয়। ময়ালীর রবিশস্যের এখনও বিকিকিনী হইতে থাকে। গ্রীষ্মের অবসানের কিছু পূর্ব্ব হইতে পাকা আমের যথেষ্ট কারবার হয়। কাঁঠাল এসময়েও সস্তা হয় না। যাহা হউক জাম যাম জামরুল খাইয়া সকলেই তৃপ্তি লাভ করে। হনুমানের আনিত সহকার ফলে সকলেই অন্য অভাব ভুলিয়া যায়। অনেকে আমের রসে পরিপুষ্ট হইতে থাকে অনেকে আবার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। পানীয় জল এসময় উষ্ণ ও পরিস্রুত করিয়া এবং অতি ভোজনের বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অনেকে ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় পার্ব্বনের মধ্যে বণিকদিগের নূতন খাতা ও মহরৎ এবং সীতা নবমী ব্রত সাবিত্রী ব্রত, জামাতা ষষ্ঠী ও শ্রীশ্রীগঙ্গা পূজা ও মনসা পূজা। এ সকল পার্ব্বণে স্ত্রীলোকেরা যত আনন্দ অনুভব করে বালকেরা সেরূপ করে না। তাহারা এ সময় হাডুগুডু অথবা ফুটবল ও হকি খেলায় উন্মত্ত হয়।

গ্রীষ্মের ঝটিকা ও উত্তাপকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত প্রাবৃটের আবির্ভাব হয়। বর্ষার প্রারম্ভে বসুন্ধরা যেরূপ সঞ্জীবনী রসে উৎফুল্ল হয়, ক্ষেত্র গুলি যেরূপ নবলতিকা, লোহিত ও সবুজশাক ও বীজ ধাঁন্যের হরিৎপ্রভা ধারণ করে, এবং ক্রমে হরিদ্রা ও বেগুনি পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করে, শ্রাবণের অবিরত বারিধারায় মস্তকোত্তলনে প্রয়াসী ফলভরে অবনত লতা দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ পাওয়া যায়। বর্ষার শেষে ধনী, ধীবর ও নৌকাজীবীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু অতিবৃষ্টির আতিশয্যে পর্ণকুটীরবাসিগণের উটজাবলী ভগ্ন হইলে তাহারা মেঘবারির সহিত অশ্রুবারি মিশাইতে থাকে। কখন বা ক্ষেত্রাদি জলমগ্ন হওয়ায় কৃষক গ্রামের দেবতার নিকট পূজা মানিতেছে। তরি তরকারী মহার্ঘ হওয়ায় এবং পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ বা পুরীষ সংগৃহীত না

থাকায় অনেকেই করতললগ্নগণ্ড হইয়া বসিয়া আছে। গ্রীষ্মের ইঁচড় এইবার দরিদ্রের উদর পূরণের নিমিত্ত কাঁটালে পরিণত হইয়াছে, অম্ল রসের ফলের মধ্যে লেবু ও আনারসে দেশ ভরিয়া গেল, এবং ধনী ব্যক্তিরা অধিক মূল্যে বেহারের ও মালদহের আম্রে রসনা পরিতৃপ্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য চাউল, ডাইল ও আলুর মূল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কচু কুষ্মাণ্ড কাঁচকলা ও নারিকেল প্রধান তরকারী রূপে পরিগণিত হইল। গৃহস্থ আর সে পয়সায় সে পরিমাণ আহার দিয়া বালকগণকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না। এদিকে মালের যোগান অপেক্ষা টান অধিক থাকায় মহাজন, ব্যাপারী ও দোকানদারের নৌকা গুলিতে নদীস্রোত পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। স্কুলের বালকেরা এই সময় জলে ভিজিয়া প্রাণ ভরিয়া ফুটবল খেলিতেছে এবং মুড়ি মটর ঝালছোলা ও চিনের বাদাম খাইয়া কখন জ্বরগ্রস্ত ও কখন উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। এদিকে অল্পবয়স্ক বালকেরা যখনই জলস্রোত পাইতেছে তখনই কাগজের নৌকা ভাসাইতেছে। রথের সময় বালকের যেমন আনন্দ পল্লীবিধবা ও নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের ও সেইরূপ আনন্দ। পল্লীর ভদ্র ব্যক্তিরাও এই সময় গাছের চারা ক্রয় করিতে মহা ব্যস্ত। এবার কেন রথ চলিল না চাকা বসিয়া গেল, অন্যবার কেন ভাল চলিয়াছিল ও অধিক লোক কাটা গিয়াছিল এবং এক এক জন কতবার রথের দড়ী স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেহ কেহ নিকটাত্মীয়কে রথচক্রে অথবা পীড়ায় হত বা মৃত হইতে দেখিয়া মনঃকষ্টে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছে এবং কেহবা প্রয়োজনীয় ও সখের সামগ্রী ক্রয় করিয়া উপহার গ্রাহকদিগের ভাবী আনন্দ মানসনেত্রে অবলোকন করিয়া পুলকভরে গন্তব্য পথের ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেছে।

প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দর্শনের পর শরতের প্রথম রশ্মি যেন হাঁসি মুখে দেখা দেয়। বালকেরা রৌদ্রের নবসঞ্জীবনী রশ্মিপ্রভাবে পুলকিত হইয়া এখন হইতে পূজার বিলম্ব কত জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। এ সময় জলমগ্ন ভূপৃষ্ঠ জল নিকাশের পর ক্রমে ক্রমে তৃণ-শ্যামল-মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে, এবং গ্রামের গাভীগুলি জলপার হইয়া ঐ তৃণ ভক্ষণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করে রাখাল বালকও সেইরূপ আনন্দে অভিভূত হইয়া গীত গাহিয়া যেন বর্ষায় সুষুপ্ত গ্রামে নবজীবন সঞ্চার করিতে থাকে। তাহার বংশীধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিলে মনের জড়তা দূরে চলিয়া যায়, এবং প্রকৃতি বিশেষে কেহ বা নূতন আবেগে কেহ বা নূতন উদ্যমে কর্ম্মময় জগতের সম্পাদ্য বিষয়ে আপনাকে আপনি নিযুক্ত করিতেছে।

যদিও এ ঋতুর ঝুলনযাত্রা রাখিপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী সেরূপ সমারোহের সহিত সর্ব্বত্র সম্পন্ন হয় না, তথাপি এক দুর্গোৎসবেই হিন্দু একশত পূজার আনন্দ অনুভব করে। নূতন বস্ত্র ও পাদুকা পরিবে বলিয়া বালকেরা যেরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পূজা দর্শন ও বিজয়ার ভাসান দেখিবে বলিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেরূপ লালায়িত হয়। ইহার পর বিজয়ার কোলাকুলিতে ক্ষুদ্র-স্বার্থ-ত্যাগ ও অনেক সময় মনের মিলন কি অদ্ভুত। শ্বেত ও লোহিত পদ্মিনী পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে যেন হাঁসিতে থাকে—কুসুমের রাণী যেন স্বয়ং আসিয়া মানব মনে নিষ্কাম ধর্ম্মের নিত্যভাব জাগরূক করিতে থাকে। গোলাপ সৌরভে ও শোভায় অদ্বিতীয় হইলেও পারস্যের পুষ্প বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, না-হইলে-নয় বলিয়া অনুভূত হয় না। এদিকে ফুলভরে "নিরাকুল" সেফালিকা বৃক্ষের তলে বালক বালিকারা শিশির-শিক্ত পুষ্পের নিমিত্ত

মহাব্যস্ত। কামিনীর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই উহা লাভ করিতে যখনই স্পর্শ করিতেছে তখনই উহারা দল হইতে ঝরিয়া যাইতেছে। বালিকারা গোছা গোছা মালা করিয়া আপনারজনদের উপহার দিয়া সুখী হইতেছে।

পল্লীতে মৎস্য সুলভ হইলেও আলু মোটেই পাওয়া যায় না, অথবা দুর্ম্মূল্য। তরিতরকারীর মধ্যে বর্ষার সেই কচু কুষ্মাণ্ড কাঁচকলা ও নারিকেল। ফলের মধ্যে আতা, মর্ত্তমান চাঁপা ও কাঁটালি কলা, ও বাতাবি লেবু। মর্ত্তমান নাকি কোনকালে মার্টাবান হইতে এবং বাতাবি নাকি ব্যাটেভিয়া হইতে প্রথম আনীত হয়।

সকলেই এ সময়, আহারীয়, নিত্য প্রয়োজনীয় ও বিলাস দ্রব্য ক্রয় করে বলিয়া মহাজন, দোকানদার ও ব্যাপারীদের যথেষ্ট বিকিকিনী চলে। এদিকে বঙ্গদেশের নূতন পণ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ পাটের নৌকাগুলিতে স্রোতস্বিনী নদী নালা পরিপূর্ণ হয়। পাটের চাষ করিয়া কৃষক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য লাভ করিতেছে এবং ধানের চাষ করিয়া কৃষক অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে টাকা পাইবে না বলিয়া হয় পূজার কেনা বেচা স্থগিত রাখিতেছে, না হয় ক্ষেত্রে কমলার ললিত উদার হাস্য মহাজনকে দেখাইয়া দাদন লইয়া সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। পল্লীতে পূজার বিজয়ায় বাজ খেলিতে হইবে বলিয়া বালকেরা নৌকা বাহিয়া এ সময় ব্যায়াম করিতে থাকে। সহরের বালকেরা যতদিন না শীত পড়ে ফুটবল লইয়াই ব্যস্ত। নূতন হিম যাহাতে না লাগে সে বিষয়ে সাবধান হইলে জরে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

হেমন্তকালে বঙ্গদেশে শীত যত না হউক হিম যথেষ্ট অনুভব করা যায়, এবং গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হইতে বাস্তবিক যেন একটি ভিন্ন ঋতু আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ সূর্য্যদেব যেন কিছু বিলম্বে উঠিতেছেন ও তাহার

যেন সেরূপ তেজ নাই এবং বৈকালে যেন শীঘ্র যাইতেছেন ও ধূমগুলি উপরে উঠিতে না পারিয়া অস্তাচল গমনোন্মুখ রবিকে যেন অন্তরালে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে। কোথায় দক্ষিণ মলয়ের অপেক্ষায় সকলেই জামা খুলিয়া বসিবে না একেবারে উত্তরে বাতাসে তাহারা গাত্র আবৃত করিতে ব্যস্ত। তরি তরকারী ফলমূল সমস্তই বিশেষ বিভিন্ন প্রকারের। আলুই কত রকমের যথা শাঁকআলু গোলআলু রাঙ্গাআলু ইত্যাদি। ফুলের সেরা গোলাপ রূপে গুণে মন হরণ করে এবং গাঁদা ফুলে বাগান আলো করে। কৃষক ধান্য কাটিয়া নবান্নের দিন বৎসরের হাঁসি একবার হাঁসিয়া লয়, কারন কিছু পরেই ম্যালেরিয়া, না হয় মহাজন, না হয় জমিদারের ভাবনায় তাহার সম্বৎসর কাটিয়া যায়। বালকেরা ফুটবল ত্যাগ করিয়া ক্রিকেট ও লনটেনিসে মনোনিবেশ করে এবং ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায় ভগিনীর নিকট ফোঁটা পাইয়া বাজি পুড়াইবে বলিয়া কালিপূজার দিন গুনিতে থাকে। সমগ্র বঙ্গের ধান্য লইয়া স্বদেশী বিদেশী মহাজনদের অতিশয় বিকিকিনী হয় এবং কৃষক যত না লাভ করে মহাজন ও ব্যাপারীরা তাহার শতগুণ লাভ করিয়া থাকে।

প্রাতঃকালীন কুয়াসা ও সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই হিম-চাপা ধূমে ভরা আকাশ দেখিলে যেরূপ শীতকালের কথা মনে পড়ে, প্রাতে ও সন্ধ্যার পুরুষজাতিও নানাবিধ রঙিন বস্ত্রে গাত্র আবরণ করিয়া যাইতেছে ও কেহ কেহ হালফ্যাসানের আজানুলম্বিত দীর্ঘ জামা পরিয়া যাইতেছে দেখিলেও সেইরূপ শীতকালের কথা মনে হয়। অন্ধের যেরূপ কিবা রাত্র কিবা দিন দরিদ্রের ও সেইরূপ কি বর্ষা কি শীত। বর্ষায় সে ভিজে মরিয়াছে এবং অতি বৃষ্টিতে হয় মজুরি করিতে যাইতে পায় নাই, না হয় জ্বালানী কাঠের অভাবে দুই বেলা অন্ন পাক করিতে পায় নাই। এ দিকে শীতে তেমন রোজগার নাই বলিয়া শীতোপযোগী বস্ত্র বা আহার বা আগুন

পোহাইবার অগ্নিও তাহার নাই। শীতকালে, আলু, বেগুণ, কপি, মূলা, যথেষ্ট। ফলের মধ্যে কমলাঙ্ক প্রদেশের লেবু, সাঁকআলু ইত্যাদি এবং ফুলের শ্রেষ্ঠ গোলাপ, ও আলো করা গাঁদা। সান্নিপাত বিকার ও সর্দ্দির জ্বালায় প্রায় সকল গৃহস্থই ব্যতিব্যস্ত। এই কালে এক এক ইস্কুলের বালকদের সহিত অপর ইস্কুলের বালকদের ক্রিকেট ম্যাচে খুব ধুমধাম হয়। শীত ঋতুতে পৌষ পার্ব্বণ ব্যতীত হিন্দুর কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পূজা পার্ব্বণ না থাকিলেও সাহেবদের বড় দিনের ছুটী সকল বালকই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কারণ ইহাতে যোগ দান করিতে না পারিলেও বেশ দীর্ঘ অবকাশ পায় বলিয়া সকলেই ইহার জন্য লালায়িত। এই সময় ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রসিদ্ধ নগরে প্রতি বৎসর সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয় সম্মিলনী এবং ব্যবহারিক শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। নূতন চাউলের ও শীতবস্ত্রের যথেষ্ট বিকিকিনী হয় এবং কাবুল দেশের সদাগরদের সহিত প্রত্যেক পল্লীতেই দেখা হইয়া থাকে।

প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দর্শনের পর শরতের সঞ্জীবনী রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার হাসি যেরূপ প্রীতিকর বোধ হয়, দারুণ শীতের পর বসন্তের মৃদু মধুর মন্দ হিল্লোল যেন তদপেক্ষা অধিক প্রাণপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। এ মধুমাসের মধুযামিনীতে কত কবির যে কত ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের যে কত পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত। ঋতুরাজ বসন্তের দূতের পঞ্চম স্বর ও সহকার মুকুলের সৌরভগীত যে কতবার গীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বসন্ত কালে ফুলের কি বাহার! অনুজ্জ্বল পীতবর্ণের চম্পক যাহা, এদেশী কেন বিদেশী কবিরাও স্মরণীয় করিয়াছেন, সেই হেম পুষ্পের সহিত শোণ বর্ণের অশোক, বাসন্তী বা মাধবী লতার পুষ্প এবং বসন্তের অবসান কালে শ্বেত বর্ণের বেলী ও যুথিকার বৈচিত্র্য দেখিলে মনে হয় জগদীশ্বর

বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষে সকল ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত যেন বসন্ত কাল দিয়াছেন। দশনেন্দ্রিয়ের নিমিত্ত নানা বর্ণের পুষ্প, শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিমিত্ত কোকিলের পঞ্চম স্বর, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিমিত্ত বিবিধ পুষ্প, স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিমিত্ত মন্দ মলয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের নিমিত্ত কদলী, শ্রীফল, ও নানাবিধ তরিতরকারী।

বালকেরা পরীক্ষার নিমিত্ত এ সময় প্রস্তুত হয় ও পরে অব্যাহতি পায়। ক্রিকেট ব্যাডমিণ্টন লনটেনিস পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিতে থাকে। শীতলা বা ওলা দেবীর কৃপায় কিন্তু সকলে মধুমাসের সুখ অনুভব করিতে পায় না। দোল পূর্ণিমায় কিন্তু সকল ঘরেই আমোদ। বালক ও কোন স্থলে যুবকেরাও ইহাতে মাতিয়া বিভোর হয়। চড়কের আর সে জাঁক জমক নাই। কতিপয় রুগ্ন ব্যক্তি ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সংযত থাকিয়া গেরুয়া বস্ত্রে চড়কের দিন পূজা দেয় মাত্র।

পয়লা বৈশাখ বণিকদিগের নূতন খাতা বলিয়া বসন্তের অবসানে-ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীরা পুরাতন খাতার কৈফিয়ৎ কাটিয়া নূতন বর্ষের জের টানিতে শশব্যস্ত। ওদিকে খোদ ব্যবসায়ীরা বিকিকিনীতে ব্যস্তসমস্ত। চৈত্র সংক্রান্তিতে গত প্রায় বৎসরের কত কথাই মনে আসে। কত কর্ম্ম অসম্পাদিত থাকে। পর বৎসর কর্ম্ম সমাপ্ত করিব বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বৎসরটী চলিয়া যায় সেটী আর ফিরে আসে না।

একটী নদী।

পবিত্র সলিলা গঙ্গার জন্মস্থান নগাধিরাজ হিমালয় গিরি। সর্ব্বপাপ-সংহারিনী কৈবল্যদায়িনী গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল উদ্ভব কথায় দেবলীলাস্থান যোগেন্দ্র বাঞ্ছিত জলদকদম্ববসনা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি যে সলিল রাশি মুকুটে ধরিয়াছে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কেহ বলে ছিলে তুমি ব্রহ্ম কমণ্ডলে"
কেহ বলে বিষ্ণুপদে তোমার উদ্ভব
ধূর্জ্জটীর জটাবন্ধে ছিলে কেহ বলে,
কেহ বলে জহ্নুমুনি পিতা হন তব,

বসুন্ধরা জীবের অনাবৃষ্টিজনিত উত্তাপ ক্লেশ নিবারণ কল্পে ঋষিগণকে কঠোর ব্রহ্মআরাধনা করিতে অনুরোধ করেন এবং তাহারই ফলে দেবতা-কৃপায় হিমাদ্রিমুকুটে সলিল রাশি সঞ্চিত হয়। যে কারণেই হউক হিমালয়ের হিমদ্রবনে জন্ম লাভ করিয়া পর্ব্বত দুহিতা গঙ্গা পর্ব্বতপথে আপনার বক্রগতি আপনিই প্রস্তুত করিয়াছে এবং তথায় ইহাঁ অতিশয় স্রোতস্বিনী। এই পার্ব্বত্য পথে কঙ্খল ও হরিদ্বারকে পবিত্র ভূমি করিয়া স্বীয় জলরাশি বহন পূর্ব্বক ক্রম-নিম্ন ভূমিতে আসিয়া মন্থরগতিতে দেহ বিস্তার পূর্ব্বক গঙ্গা পূর্ব্বদিকে প্রধাবিতা হইয়াছে। এখন হইতে ইহার নির্ম্মল জলের বর্ণও আর্য্যাবর্ত্তের মৃত্তিকা ও বালুকার সহিত মিশ্রিত হইয়া গৈরিক বর্ণ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে ইহার নিম্নগর্ভে, বরণীয়া ও কৃষ্ণলীলা-কথামৃতে সতত সংস্পৃক্তা যমুনা, ভক্তের অর্ঘ্য স্বরূপ স্বীয় সলিল রাশি আনিয়া মিশ্রিত করিয়াছে। পুণ্যতোয়া গঙ্গা যথায় যমুনা-জল-প্রবাহের সহিত মিলিতা হইয়াছে সে স্থানটী বড়ই রমণীয়। যমুনা-

তরঙ্গ-মিশ্রিত-গঙ্গা কোথাও ইন্দীবর ও কোথাও শ্বেত পদ্মের মালার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। এই স্থানের পবিত্র তটে কত কুম্ভমেলা ও পবিত্রাত্মার সমাবেশ হইয়াছে এবং উহা অবলোকন করিতে যে কতবার কত অসংখ্য ধর্ম্ম-প্রাণের সমাগম হইয়াছে এবং তাহাদের বাস্তব অভাব মোচন করিতে উভয় নদী বহিয়া যে কত পণ্য সম্ভারে ও বণিকবৃন্দে পরিপূর্ণ নৌকার গমনাগমন হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা করা যায়না।

যমুনার জল গ্রহণ করিয়া গঙ্গা স্ফীত বক্ষে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিতে এবং মানবমনে নবজীবন সঞ্চার করিতে করিতে পুণ্যভূমি দেবতাবাঞ্ছিত মর্ত্তের স্বর্গ কাশীধামে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এই স্থানেই ভক্তদের মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে যে গঙ্গাকে কাশীধাম পবিত্র করিয়াছে না কাশীধামকে গঙ্গা পবিত্র করিয়াছে। যাহা হউক গঙ্গা লইয়াই কাশীধামের পবিত্রতা এবং কাশীধাম লইয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য, কারণ কাশীধামের গঙ্গাতটে যে কত মহাত্মা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা করা যায় না।

এইবার শোণ নদের ঈষৎ শোণ বর্ণের জলরাশি বহন করিয়া গঙ্গা বঙ্গদেশের পূর্ব্বকার রাজধানী পাটলীপুত্র বহিয়া চলিতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গের শস্য ভাণ্ডার এই উভয় নদী দিয়া পাটনায় উপস্থিত হইয়া তথাকার বাণিজ্য সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। আজি কালি উহা বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় আনীত হয়।

অধিক জলরাশী বহন করিয়া গঙ্গা ক্রমে প্রবল মুর্ত্তি ধারণ করিয়া পদ্মা ও পরে মেঘনা নাম ধরিয়া পূর্ব্ব বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। জলরাশির আধিক্যেই হউক, অথবা করুণার আবেগে পথিমধ্যে ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় সগর বংশের উদ্ধারের নিমিত্তই হউক গঙ্গা স্বীয় জলরাশির কতকাংশ দান করিয়া মানব জনের মঙ্গলার্থে ও নানা নগরীকে সমৃদ্ধ করিতে ললিতাকুঁড়ির নিকট সমুদ্রের অভিমুখে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সগর বংশের কতদূর পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রকারগণ দেখিবেন। কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি যে ভাগীরথী উভয় পার্শ্বে সমৃদ্ধিশালিনী বহু নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে ঋদ্ধাপণশ্রেণি সমন্বিত হইয়া কত ধনী লোকের আবাসস্থান বলিয়া সগর্ব্বে ইহার তীরে এখনও দণ্ডায়মান। অধুনা রপ্তানী ও আমদানীর পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বাষ্পীয় পোতে আজি গঙ্গার দক্ষিনাংশ পরিপূর্ণ। ভরাপালে ঢেউ ভাঙ্গিয়া কত যে দেশীয় বৃহদাকারের নৌকা পাটের গাঁইট বহন করিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহারই বা সংখ্যা কে করিবে। যে পলাশী প্রাঙ্গনে মুসলমান রাজলক্ষী বিচলিতা হইয়াছিলেন সে প্রাঙ্গন ভাগীরথী স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া আজিও ইতিহাসের একটী ঘটনা জাজ্জ্বল্যমান রাখিয়াছে। কিন্তু পথিমধ্যে নবদ্বীপের স্মার্ত্তশিরোমনির জয় ঘোষনা করিতেও ভাগীরথী বদ্ধ পরিকর। পূর্ব্বকার পণ্ডিতমণ্ডলী ভাগীরথী-তরঙ্গ-সম্পৃক্ত তীরবাত ও তীরের পবিত্র ভূমি সম্বন্ধে কত না সুখ্যাতি করিয়াছেন। বঙ্গের সুধী ও ভক্তবৃন্দ পূর্ব্বে গঙ্গাতীর ব্যতীত বঙ্গের অন্য কোন স্থান অধিক রমনীয় বিবেচনা করেন নাই। ভক্ত বল পণ্ডিত বল সাধক বল বঙ্গদেশের কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ ভাগীরথী তীরে না উদ্ভূত হইয়াছেন? অবতার মধ্যে চৈতন্য, ভক্ত মধ্যে রামপ্রসাদ, কবি মধ্যে ঈশ্বর চন্দ্র, তার্কিক মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভাবুকের মধ্যে বুনো রমানাথ, কে না ভাগীরথীতীরের সুখ্যাতি করিয়াছেন? কেনা আত্মহারা হইয়াছেন? ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে বদ্বিপ বঙ্গদেশ গঙ্গার কৃপায় উদ্ভূত হইয়াছে। এ কারণে বঙ্গদেশ নিতান্ত সমতল। সমতল ভূমির চিরন্তন প্রথা অনুসারে নদী গর্ভে জলরাশির আধিক্য হইলেই তীর ভূমি ভগ্ন হয় ও জল প্লাবন দেখা দেয়। এ কারণে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি বৎসরই গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ অববাহিকা ভূমি প্লাবিত হয় ও জল নিকাশের পর ভূমির উর্ব্বরা ও উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় শস্য সম্ভারে কখন দেশ পরিপূর্ণ হয়

এবং কখন বা জল নিকাশ হইতে বিলম্ব হওয়ায় শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। কিছু পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গও এইরূপ প্লাবিত ও ধৌত হইয়া ব্যাধিমুক্ত হইত, আজিকালি লগিতাকুঁড়ির বাধ হওয়ায় ক্ষেত্রস্থ শস্য রক্ষিত হইতেছে বটে কিন্তু ব্যাধির প্রকোপ কমিতেছে না। কেবল ভাগীরথী যে বঙ্গদেশের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে এরূপ নহে, গঙ্গাও আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি তথাকার অববাহিকা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তথায় উৎপন্ন শস্য সামগ্রীর সুলভ পরিচালন কল্পে এরূপ সহায়তা করিয়াছে যে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সহিত কানপুর, প্রয়াগ, পাটনা ইত্যাদি স্থান পণ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

যে আর্য্যাবর্ত্ত আদিম সভ্যতার উদ্ভব স্থান, যথায় অবতারপরম্পরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তি জীবন্ত রাখিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, পানিপথ ইত্যাদি স্থান বিদ্যমান থাকিয়া যথায় সম্রাজ্য পরম্পরার উত্থান ও পতন ঘোষণা করিতেছে, যথায় বহু পুরাতন ধর্ম্মের কীর্ত্তি আজিও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত, সেই আর্য্যাবর্ত্তের যশঃ, কীর্ত্তি, উর্ব্বরতা, এমন কি উহার স্থায়িত্ব গঙ্গার মহৎ দান। এ দানের পরিসীমা নাই। এই দানের ফলে বকারদ্বিপ বঙ্গদেশের উদ্ভব এবং ভাগীরথীর স্থায়িত্ব। এবং এই ভাগীরথীর স্বভাবে বঙ্গদেশ সুজলা, সুফলা, ও কাননবৎ পরিশোভিত। কেবল ঐহিক নহে গঙ্গা আমাদের পারত্রিক-লোকেরও মঙ্গলদায়িনী। গঙ্গায় অবগাহনে পাপরাশি বিধৌত হয়। গঙ্গোদকে অপবিত্র স্থান পবিত্র হয়। গঙ্গামৃত্তিকায় চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। অন্তিমকালে গঙ্গাবক্ষে প্রাণবায়ু ত্যক্ত হইলে স্বর্গবাস হয় এবং অন্যত্র মৃত্যু হইলেও গঙ্গাতীরে দেহসৎকার হইলে মৃত ব্যক্তির সদ্গতি হয়। এই কারণেই গঙ্গা আমাদের সুখদা ও মোক্ষদা।

রেল পথ।

আমাদের দেশে লৌহচক্রের (অয়শ্চক্র) কথা শুনা যায় বটে কিন্তু লৌহ বর্ত্মের কথা বড় একটা শুনা যায় না। ইংলণ্ডে কিন্তু একশত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ট্রাম পথের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে কাষ্ঠের উপর লোহার পাত মুড়িয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিত এবং পরে এখনকার মত সমস্ত লোহার রেলের পথ নির্ম্মিত হয়। এই লৌহবর্ত্মের উপর যে গাড়ি চলিত উহা কয়লার আকর হইতে কয়লা আনিতে ব্যবহৃত হইত এবং অশ্বদ্বারা উহা গমনশীল হইত।

যে দিন ওয়াট্ (watt) ষ্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবন করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিলেন সেই দিন হইতে লৌহবর্ত্মের সার্থকতা হইল। তাঁহার উদ্ভাবিত এঞ্জিন এবং এখনকার এঞ্জিনে অবশ্য অনেক পার্থক্য আছে। অধিক কয়লা ভস্মীভূত হইলেও তাঁহার এঞ্জিন দ্রুত যাইতে সমর্থ হয় নাই। পরে ১৮১৫ খৃঃঅব্দে জর্জ ষ্টীভেন্সন নামক একজন সামান্য ব্যক্তি উহা নির্দ্দোষ ও সুসম্পন্ন করেন। এই মহাত্মা প্রথমে রাখালের কার্য্য করিতেন ও পরে কোন খনিতে কার্য্য করিতে করিতে ইঞ্জিন প্রস্তুত কর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন। তথাকার রাত্রের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়া তিনি মেকানিকস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত নানাবিধ সুপুস্তক পাঠের সাহায্যে কৃতকার্য্য হয়েন। ১৮২২ খৃঃ তিনি ষ্টকটন এবং ডয়ার্লিংটনের রেলপথের অনুষ্ঠাতৃগণের অশ্বের পরিবর্ত্তে এঞ্জিন ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি বলবতী করাইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান সুফল হওয়ায় কেবল কয়লা কেন যাত্রীরাও সুলভে এবং অতিসত্বর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইতে সমর্থ হয়েন।

ইহার প্রায় ৮০ বৎসর পরে ভারতবর্ষে প্রথম লৌহবর্ত্ম স্থাপিত

হয়। সিপাহিবিদ্রোহের সময়ও কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জের অধিক রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। খৃঃ ১৮৭০ সালে ভারতে ৪৭০০ মাইল রেলবিস্তার হইয়াছিল মাত্র এবং খৃঃ ১৮৯২ সালে ১৭,৫৬৬ মাইল রেলবিস্তার হয় এবং ক্রমশই রেলবিস্তার হইতেছে। ১৮৮৯ সাল হইতে রেল বিস্তারের সহিত ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছে।

এই রেল বিস্তারের সহিত নগরগুলির লোক প্রায় সকল প্রকার তরিতরকারী এবং দেশ বিশেষের সুলভ মূল্যের শস্যাদি কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে উপভোগ করিতেছে এবং দশ দিনের পথ একদিনে যাইতেছে অথবা দশদিনের খবর একদিনে পাইতেছে।

যে সকল উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী পূর্ব্বে স্থানীয় মুল্যে বিক্রীত হইত, অধুনা যে দেশে যাহাদের অধিক অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তথায় সেগুলি রেলের সাহায্যে আনীত হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই বিক্রয়ে লাভ দেখিয়া তথাকার লোকে আরও অধিক সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতেছে। অধিক উৎপাদনের সহিত অধিক ভূমিরও আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে এবং অধিক প্রস্তুতির সহিত অধিক শ্রমজীবীরও প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। এইকারণে জমীর খাজনাএবং শ্রামিকের মজুরি বৃদ্ধি হইতেছে। উৎপাদন ও প্রস্তুতির আধিক্যে যখন দেশের ব্যবহার বাদে পণ্য-সামগ্রী উদ্বৃত্ত হইতেছে, তখনই রেলের সাহায্যে অল্প খরচে বন্দরে আনীত হইয়া, ঐগুলি অন্যদেশের অভাব দূর করিতেছে ও তদ্বিনিময়ে উৎপাদক দেশকে অন্য ধনসামগ্রীতে পূর্ণ করিতেছে অথবা দেশের ধনাগমে সহায়তা করিতেছে।

এই রেলের সাহায্যে সহরতলীর নিকটস্থ অধিবাসিগণ যাহারা সহরে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহারা বসতবাটী ত্যাগ না করিয়া দেশে থাকিয়া তথাকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতেছেন। তাহাদিগকে পৈতৃক বাটী

বাগান পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে হইলে কেবল উপার্জ্জিত বেতনে জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ বা সমাজানুমোদিত ক্রিয়া কলাপ করিতে হইত না। নিজগৃহে প্রতিপালিত গাভীর সদ্যঃ দোহন করা দুগ্ধ বা পুষ্করিণীর সুমিষ্ট মৎস বা তাজা তরকারীর আস্বাদন কেবল কথার কথা বলিয়া মনে হইত। রেলের মাসিক টিকিটের মূল্যের সুলভতাই ইহার একমাত্র কারণ বুঝিতে হইবে।

পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা রেলের সাহায্যে আরামে অতি সত্বর বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যদায়ক স্থানে যাইতে পারেন। দুই তিন শত মাইল পথ ৮।১০ দিবসে গোশকটাদি বা শিবিকায় যাইতে হইলে প্রথমতঃ পীড়িতেরত যাওয়াই সম্ভবপর হইত না, দ্বিতীয়তঃ পরিচর্য্যার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনের যাতায়াতের ব্যয়ভারও গমনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচিত হইত।

সীমান্তে আক্রমণ-ভয় উপস্থিত হইলে রেলের সাহায্যে দূরেস্থিত সেনা সমূহ তথায় অচিরে সমবেত করা কষ্টকর হয় না। দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হইলেও রেলের সাহায্যে উহা সত্বরই প্রশমিত হয়। যে কারণে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, রেলের দিনে সে কারণ উপস্থিত হইতে পারিত না।

সত্বর গমনাগমন ও পত্রপ্রাপ্তি, সুলভে পণ্যসামগ্রী পরিচালন এবং দেশ বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা সাধন করিতে, রেলপথ-বিস্তারের সহিত কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কি বণিক, কি রাজস্ব যে পরম উপকার পাইতেছে উহা সভ্যতাসূচক এবং কল্যাণবিধায়ক। যে দেশে উহার উপকারিতা উপলব্ধ হয় নাই, সে দেশের উন্নতি ও ধনাগম সুদূরপরাহত।

THE PENY POST--ITS HISTORY & UTILITY.

পোষ্ট বিভাগের আবশ্যকতা।

চিঠি পত্র পাঠাইবার মাশুল স্বরূপ ষ্ট্যাম্পগুলি প্রথমে ১৮৪০ খৃঃ লণ্ডন নগরে প্রবর্ত্তিত হয়, পরে উহা ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে এবং এখন প্রায় সমস্ত সভ্যদেশে আবশ্যক ও অনিবার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে কি পত্র প্রেরিত হইত না? যে দিন হইতে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পত্রপ্রেরণের কোন না কোন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ উপায় ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে উপকার সাধনে কখনই সমর্থ হয় নাই। ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য না লইলে পত্র কখনই পঁহুছিতে পারে না এবং একটী ব্যক্তির গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার ও প্রত্যাগমনের ব্যয়, দূরতা ও পথের অবস্থার উপর নির্ভর করে। এবং ঐস্থানে যদি শীঘ্র পঁহুছিতে হয় তাহা হইলে মনুষ্য অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল কোন পশু বা যানের আবশ্যকতা অনুভব করিতে হয়। এক ব্যক্তির যাতায়াতের ব্যয়-ভার বহন করিয়া পত্রদ্বারা সংবাদ প্রেরণ যে ব্যয়সাধ্য তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এবং রেল খাল রাস্তা যখন বিস্তৃত হয় নাই তখনকার দিনে যে উহা অধিকতর ব্যয়সাধ্য ছিল তাহাও অনুমান করা সহজ। এবং ঐ ব্যয় যে সকলে বহন করিতে পারিত না উহা বিচিত্র নহে।

এই নিমিত্তই দুঃসংবাদ পূর্ব্বকালে পঁহুছিতে বিলম্ব হইত। স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তি গৃহে গমন করিলে বা দেশান্তরে গমন করিলে তাহার স্বদেশবাসীরা প্রবাসীর বা গৃহাগতের সংবাদ পাইতেন। তীর্থপর্য্যটনকারিগণের সাহায্যেও সংবাদ পাওয়া যাইত এবং কুলপুরোহিতেরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকরণে বহির্গত হইলেও সংবাদ পাওয়া যাইত। সুখ সন্দেশ থাকিলে নরসুন্দরেরা উহা বহন করিয়া পারিতোষিক লাভ করিত।

ইংলণ্ডের মত দেশে কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে ডাকের বন্দোবস্ত ছিল। উহা কিঞ্চিৎ ব্যয় সাপেক্ষ ছিল বলিয়া দরিদ্র ব্যক্তিরাই কেবল পত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না। কারণ প্রেরককে অগ্রিম মাশুল দিতে হইত না এবং গ্রাহক অর্থ দিয়া পত্র গ্রহণ করিতেন অথবা অসমর্থ হইলে পত্র ফেরৎ দিতেন।

এক দিন ইংলণ্ডের কোন একটী পান্থনিবাসে যখন ডাকহরকরা আসিয়াছিল, ঠিক সেই সময় কোন একটী ভদ্র পথিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী অল্পবয়স্কা বালিকা তাহার ভ্রাতার হস্ত লিপি সম্বলিত পত্র পাইয়া যুগপৎ হৃষ্ট ও বিমৃষ্ট হইল এবং কিছু পরে পত্র খানি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রত্যর্পন করিল, কারণ তাহার নিকট উহার মাসুল স্বরূপ একটী সিলিং ছিল না। পূর্ব্বোক্ত ভদ্র পথিক কারুণ্যের আবেগপরবশ হইয়া নিজ হইতে মাসুল দিয়া এইবার বালিকাকে পত্র খানির অধিকারিণী করিলেন। পরে ডাকহরকরা প্রস্থান করিলে বালিকা প্রকাশ করিলেন যে তাহার ভ্রাতার সহিত পূর্ব্ব হইতে সঙ্কেত সমূহের ব্যবস্থা করিয়া তিনি পত্র মধ্যে যাহা কিছু বক্তব্য ছিল তাহার বহিভাগ হইতে অনুমান করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে পথিক পত্রের মাসুল কিরূপে হ্রাসকরা যায় এবং দূরতার উপর ধার্য্য না হইয়া যাহাতে ভারের উপর মাসুলের তারতম্য হয় এই চিন্তাস্রোতে আপ্লুত হইয়াছিলেন। গ্রাহক মাসুল না দিয়া প্রেরক যদি অগ্রিম উহা অর্পন করে তাহা হইলে অবশ্যই পত্রাদির পরিচালনা অধিক হইবে, এবং ডাকবিভাগের আয় হ্রাস না হইয়া কালে উহা রাজ্যের অন্যান্য অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবে ও সাধারণের মঙ্গল সাধন করিবে।

এই ধারনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৩৭ সালে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সাধারনের উপর বিচার ভার দিলেন। জগতের অন্যান্য নূতন অনুষ্ঠানে যেরূপ বাধা প্রাপ্তি সম্ভবপর ঐ ক্ষেত্রেও তাহা ঘটিল,

তথাপি ১৮৪০ খৃঃ উহা আইন আকারে পরে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহানুভব পথিকের নাম রোলাণ্ড হিল। তিনি পরে পোষ্ট আফিসের প্রধান সহকারী হইয়া ঐ বিভাগে নানা প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে সার উপাধিপ্রাপ্ত হয়েন।

পত্রাদি প্রেরণের এই সুলভ বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কত যে কল্যান সাধিত হইয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সামান্য মূর্খ লোকও ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যে সুদূর প্রবাসী আত্মীয়ের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ পাইয়া থাকে। হস্তলিপি শিক্ষা করিতেছে এরূপ অল্পবয়স্ক বালকও "তুমি কেমন আছ আমি ভাল আছি" লিখিয়া তাহার পরমাত্মীয়ের হৃদয়ে বাৎসল্য প্রেম জাগরূক করে। পদোন্নতি বা অর্থাগম বা নূতন অনুষ্ঠান বা নবসূত্রে আবদ্ধ হইবার সুসংবাদ পাইয়া কতলোক আনন্দে ও প্রেমে উথলিত হইতেছে। বিপদে পড়িয়া কতলোক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পত্রে তাঁহার পরিণত অমূল্য মত প্রাপ্ত হইয়া বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইতেছেন। তাহাকে কর্ম্মস্থানও পরিত্যাগ করিতে হইল না, যাতায়াতের ব্যয়ভার ও স্কন্ধে লইতে হইল না, কেবল দুইটী পয়সা খরচ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য বিষয়গুলি পরে পরে সন্নিবিষ্ট করিয়া এককালে মনের সমস্ত ভাব গুলি পরিস্ফুট করিয়া পত্রমধ্যে সংযোগ করিতে হইল মাত্র। কি ব্যয় সক্ষেপ। কি সময়ের সদ্ব্যবহার। কি সুন্দর কার্য্য সমাধান। কি নিরুদ্বেগ। কি আনন্দ বর্দ্ধন।

ইংলণ্ড হইতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের পরিণত অভিমত ডাকযোগে ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধির নিকট আসিয়া রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেছে এবং রাজপ্রতিনিধি হইতে ছোট লাট, ছোটলাট হইতে মাজিষ্ট্রট ইত্যাদি হইয়া চৌকিদার পর্য্যন্ত ডাকযোগে রাজাজ্ঞা আসিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। সমগ্র রাজ্যের বাণিজ্য কার্য্য সুচারু রূপে সংক্ষেপে সম্পাদিত হইয়া সমাজের অভাব দূর করিতেছে। এক কথায় কি ব্যক্তি,

কি সমাজ, কি বাণিজ্য, কি রাজত্ব, সমস্তই সুলভ ডাক বিধির কল্যাণময়ী শক্তির প্রভাব অনুভব করিতেছে।

মুদ্রাযন্ত্র।

আজ যে মুদ্রাযন্ত্র বঙ্গদেশের সমৃদ্ধ নগরী মাত্রেই দৃষ্ট হয় তাহা বহু অতীতের কথা নহে, যদিও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি নিবহ বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার ব্যবহার মহোপকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যে যন্ত্রের ইংলণ্ডে প্রচলন হয় তাহা পরে ভারতবর্ষে বণিকেরা আনয়ন করিয়া থাকেন। ভাষা বিশেষের অক্ষরের বৈচিত্র্য হেতু ভারতবর্ষের ভাষায় মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার কিছু বিলম্বে প্রচলিত হইয়াছে।

চীন ভাষার এক একটী অক্ষর এক একটী ভাব প্রকাশ করে, একারণে কাষ্ঠফলকে প্রথমে চীন ভাষায় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রণয়নের উপায় প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। কোন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইলে তথায় পূর্ব্বে একটী পৃষ্ঠা একটী কাষ্ঠ ফলকে খোদিত হইত এবং সেই কারণে ভুল থাকিয়া গেলে তাহা সংশোধিত হইবার কোন উপায়ই থাকিত না। পরে দোষ সংশোধন করিতে ধাতু নির্ম্মিত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের সৃষ্টি হয় এবং অক্ষর বিন্যাসের প্রথা আবিষ্কৃত হয়। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম্ ব্যাক্সটন নামক একব্যক্তি ব্রাসেলস্‌দেশ হইতে শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করেন। ইহার প্রায় দেড় শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচলিত হয়।

পূর্ব্বে প্রতি পুস্তকের প্রতিপৃষ্ঠা নূতন করিয়া লিখিতে হইত, মুদ্রা-

যন্ত্রের আবিষ্কারের পর অক্ষর বিন্যাসের সাহায্যে একপৃষ্ঠা প্রস্তুত হইলে সেই পৃষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যা মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও সভ্য জগতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। তাই আজি কালি নিত্য নূতন মুদ্রাঙ্কন পন্থার আবিষ্কার হইতেছে। বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিলাতী টাইমস্ সংবাদ পত্রের স্বত্বধিকারী এবং সম্পাদকের যত্নে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইতি পূর্ব্বে যদি একশত তা কাগজ মুদ্রিত হইতে পারিত ইহার পর হইতে সেই সময়ে সহস্র তা মুদ্রিত হইল। আজিকালি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা রবিবারে ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া এক ঘণ্টায় পঁচিশ সহস্র সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছে। এই সময়সংক্ষেপের ফলে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও উহা পরদিন প্রভাতে সকল গ্রাহকের নিকট মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রেরিত হইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও মুদ্রাঙ্কন প্রণালীর নব নব উপায় উদ্ভাবিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়ায়, অসম্ভব শ্রমসংক্ষেপের ব্যবস্থা হইয়াছে। একারণে কেবল যে লক্ষ ব্যক্তির কর্ম্ম শ্রমবিভাগে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হইতেছে এরূপ নহে, পুস্তকাদির মূল্য এত অধিক সুলভ হইয়াছে যে ধনী নির্ধন যে কেহই এখন পুস্তক ক্রয় করিতে সমর্থ। ইহারই ফলে সাধারণের জ্ঞান প্রচারের পথ অতিশয় সরল হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহার পাঠের ইচ্ছা ছিল তাহাকে পাঠ্য পুস্তক দেখিয়া নিজের পুস্তক লিখিয়া লইতে হইত। ধন্য সেই পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহারা ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সমগ্র বেদ বেদান্ত স্বহস্তে লিখিয়া পরে তাহার পাঠ সমাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের যতই কেন সুখ্যাতি করিনা, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সকলের কিন্তু ঐরূপ ধৈর্য্য থাকিতনা। কে জানে কত উদ্যমশীল ব্যক্তি ধৈর্য্য হারাইয়া পরে লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই—কে জানে পূর্ব্বকার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহকল্পে অধিক জটিল সমস্যা না থাকিলেও তৎকালীন শিক্ষা বিস্তার কিভাবে সীমাবদ্ধ

ছিল। সুধীবর্গের কোন নূতন তত্ত্ব, বিজ্ঞানবিদ্ দিগের নূতন আবিষ্ক্রিয়া অথবা এক এক দেশের ঘটনাচিত্র, মুদ্রাঙ্কিত হইলেই ডাকযোগে যথাসময়ে জগতের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। মধ্য রজনীতে ডাক বা তারযোগে প্রাপ্ত সংবাদ তৎকালে মুদ্রিত হইতেছে এবং পরদিন প্রভাতেই লোকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে। কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, কি অন্য শাস্ত্রে সুলভে জ্ঞানলাভ করিতে, মুদ্রা যন্ত্র যে কি পরিমানে সহায়তা করিয়াছে তাহা মুদ্রাযন্ত্রের অভাব অনুভূত না হইলে আজি কালি বোধগম্য হয়না। ইহারই ফলে সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি, বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং কোথায় কোন বিষয় আলোচিত হইতেছে, এমনকি কোথায় কর্ম্মখালি আছে তাহা, সম্যক অবগত হইয়া আপন জীবনের গতিপথ অতি সত্বর নির্দ্ধারিত করিতে সচেষ্ট হইতেছে। বস্তুতঃ মুদ্রাযন্ত্র এরূপ প্রয়োজনীয় যে, ইহার এক দিনের অভাব অনুভূত হইলে, জগতের সমধিক অভাব পরিদৃষ্ট হইবে। ইহার ন্যায় মহোপকারী যন্ত্র জগতে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কয়লা।

কয়লার ভাল নাম মৃদঙ্গার। ইহা মৃত্তিকার স্তরের মধ্যে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। "কয়লা এক এক স্থানে মাটি অল্প খুঁড়িলেই পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর মাটির অনেক নীচে থাকে। পৃথিবী এক কালে এরকম অবস্থাতে ছিল যে গাছপালা ছড়া আর কিছুই থাকা সম্ভব ছিল না। সাপ এবং মাছ ইত্যাদি আরও কিছুকাল পরে থাকা সম্ভব হইয়াছিল; এবং ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এ অনেক কালের কথা—এর কাছে মান্ধাতার আমালত কাল বলে মনে হয়। সেই সময় গাছপালা এত সতেজ ছিল যে তখনকার ঘাসগুলি এখনকার তালগাছের সমান। ভূমিকম্পেই

হউক কিংবা অন্ত উপায় ক্রমে হউক ঐ সকল গাছ পালা ভূগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে এবং সেখানে উত্তাপে এবং চাপে কয়লায় পবিণত হইয়াছে। কয়লা খুঁড়িতে খুড়িতে গাছপালাব চিহ্ন, কখন বা আস্ত গাছের গুঁড়ির মত পাওয়া গিয়াছে”।*

“সব মাটির নীচেই কয়লা থাকে না। কোন স্থানে কয়লা আছে সন্দেহ হইলে সরু চোঙ বসাইয়া কয়লা আছে কি না এবং যদি থাকেত কি পবিমাণে এবং কত নীচে আছে, এই সব পবীক্ষা কবা হয়। তাহাব পর খনিব কাজ আবম্ভ করা হয়। দুই তিন স্থানে বড বড় কূপের খনন কবা হয়। এই কূপেব উপব কপি কল বসান হয়। কপিকলের সাহায্যে নীচে যাইবাব এবং নীচেব কয়লা উপরে আনিবার বড় বড কাঠেব টব কিংবা খাঁচা ব্যবহাব কবা হয়, কূপেব নীচ হইতে কয়লা খুঁড়িতে আবম্ভ কবিয়া ক্রমে বাস্তা প্রস্তুত কবা হয়, এই প্রকারে রাস্তা এবং তাহাব শাখা প্রশাখা বাড়িতে বাড়িতে নীচে একটী প্রকাণ্ড সহবেব মত হইয়া পড়ে।”

উৎকৃষ্ট কয়লা দেখিতে মসৃণ এবং দাহিকা শক্তি সম্পন্ন। এই ধাতুজ সামগ্রীতে আঙ্গাবিক (Carbon) অংশ অনেক অধিক এবং অংশেব আধিক্যতা ও অল্পতা অনুসাবে কয়লার শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনত্ব অনুমিত হয়। উৎকৃষ্ট কয়লার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে উহাতে অগ্নি প্রদান করিলে অগ্নিশিখা, ধূম এবং ভস্মেব অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। এই জাতীয় কয়লায় অত্যন্ত উত্তাপ সাপেক্ষ সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং বাষ্পীয় যন্ত্র চালনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিলে অধিক তৈলজ বাষ্প নির্গত হয়। এ কারণে এই শেষোক্ত কয়লা হইতে গ্যাস বাহিব করা হয় এবং গ্যাস বহিষ্কৃত কবিয়া

---

* প্রকৃতি।

যে কয়লা থাকে (Coke) উহাতে গৃহস্থের রন্ধন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

"যখন এই কয়লা প্রথম মাটি কাটিয়া বাহির করা হয়, কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতেন না, কাজ করান ত দূরের কথা। তাহার পর ক্রমে গরীব লোকেরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। প্যারিস নগরে কয়লা চালাইবার জন্ত যখন চেষ্টা করা হয়, প্যারিসবাসিগণ তখন কয়লাকে তাড়াইয়া দেন। সেখানকার ডাক্তার এবং পণ্ডিতগণ কয়লার বিপক্ষে দাড়াইলেন, তাঁহারা বলিলেন কয়লা বড় খারাপ জিনিস—ইহার ধোঁয়াতে বায়ু বিষাক্ত হইয়া যায়, বাড়ীর কাপড় চোপড় ময়লা হইয়া যায়, শরীরের অনেক অপকার করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ মেয়েদের রঙ ময়লা হইয়া যায়। এই সব শুনিয়া ফরাসীদের রাজা দ্বিতীয় হেনরি আইন জারী করিলেন যে, যিনি কয়লা ব্যবহার করিবেন তাহাকে অর্থ দণ্ড এবং কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহাদিগকে কয়লার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং সেখানকার রাজা চতুর্থ হেনরী কয়লা ব্যবহার করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই এক দিন ছিল আর আজ কাল আর এক দিন দেখ। আজ কাল কয়লা কয়লা কয়লা। কয়লা ছাড়া আর কাজই নাই, কলিকাতার মত সহরে কয়লা দ্বারা এত কার্য্য করাণ হয় যে, কলিকাতার আকাশ কয়লার ধোঁয়াতে সকল সময়ই মেঘাচ্ছন্ন।

"কয়লার কাজের কথা আর কত বলিব—কয়লার দ্বারা কি কি কাজ না হয় বলিলে বরং দুই একটি পাওয়া যায়। কলিকাতায় যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ত কথাই নাই—কয়লায় খাওয়া কয়লায় চলা ফেরা—সবই কয়লায় বলিলে হয়। কয়লা গরম করিয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই সমস্ত রাস্তায় আলো দেওয়া হয়। গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় আলকাতরা এবং আরও কত কি পাওয়া যায়। আলকাতরা

হইতে আবার কত সুন্দর সুন্দর রঙ প্রস্তুত হয়। ম্যাজেণ্টা ইত্যাদি লাল সবুজ যত রঙ বেশীর ভাগ আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। কয়লা হইতে আজ কাল চিনি এবং সৌগন্ধদ্রব্যাদিও হইতেছে। আলকতিরা হইতে আবার দুই একটি ঔষধও প্রস্তুত হয়"। *

যে দেশে ধাতুজ সামগ্রী প্রকৃতির দান সে দেশের বাণিজ্য সম্পদও অবশ্যম্ভাবী। যদি কোন দেশে অধিক ধাতুজ সামগ্রী উত্তোলন করা যাইতে পারে এবং তথাকার লোকও যদি সেই সকল সামগ্রী বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিতে জানে তাহা হইলে সে দেশ, ক্রমে সমৃদ্ধ ও বলশালী হয়, কারণ বুদ্ধি ও ধনবলই প্রধান বল। ইংলণ্ডের লৌহ খনির নিকট যদি কয়লার খনি না থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ড আজ লৌহ জাত কলকারখানা, অর্ণবযান ইত্যাদিতে জগতের মধ্যে ধনী হইতে পারিত না।

জগতের সমগ্র অরণ্যের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেও শীত প্রধান দেশের ব্যক্তি সমূহের ইন্ধনপ্রাপ্তি এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনকার্য্য সম্ভবপর হইত না। কি লৌহ, কি পিত্তল, কি তাম্র, সমস্ত ধাতু বা সামগ্রী কখনই ব্যবহার যোগ্য খাঁটী অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খাদ হইতে বিমুক্ত করিতে বিশিষ্ঠ অগ্নির উত্তাপ আবশ্যক এবং এই দাহিকা শক্তি মৃদঙ্গারেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজ, কাপড উত্যাদি প্রস্তুত করিতে যে বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনা আবশ্যক, তাহা কয়লাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্তুত কয়লা না থাকিলে অর্ণবপোত-চালনা, বাষ্পীয়শকট চালনা, এমন কি বিদ্যুৎ জন্মাইতে বাষ্পীয়যন্ত্রচালনাও অসম্ভব হয়। অতএব রন্ধন কার্য্য হইতে সভ্য সমাজের সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে এবং সহজে ও সুলভে উহা প্রাপ্ত হইতে, কয়লাব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই।

---

* প্রকৃতি।

ভূমিকম্প।

পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ। ভূবিদ্যায় অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টীর প্রথমাবস্থায় অতিশয় উষ্ণ ছিল এবং ক্রমে ক্রমে উহার উপরিভাগ শীতল হইয়া প্রথমে জল রাশিতে আবৃত হইয়াছে ও পৃথিবীর মৃত্তিকাভাগ সেই অসীম জল রাশির নিম্নে স্তরে স্তরে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভূমি কম্পের প্রকোপে এই বালুকাজাত স্তর জলরাশির উপর উত্থিত হইয়াছে এবং অধঃস্থ গলিত ধাতু সামগ্রী উপরে উদ্গিরিত হইয়া কঠিন প্রস্তরময় পাহাড়রূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পাহাড় অনেক সময় জলগর্ভেই সঞ্জাত হইয়াছে এবং পরে আভ্যন্তরিক নৈসর্গিক শক্তির প্রভাবে জলরাশির উপর উত্থিত হইয়াছে। জগতের উচ্চতম পর্ব্বত নগাধিরাজ হিমালয়ের উপরেও সমুদ্রজ কীটের চিহ্ন এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীর উপরিভাগ প্রথমে শীতল হওয়ায় ভূত্বক কঠিন হইয়াছে এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণ দ্রব সামগ্রী ক্রমশঃ যতই শীতল হইতেছে অথবা তাপ বিকীরণ করিতেছে, ততই স্থানে স্থানে সঙ্কোচন আরম্ভ হইতেছে অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকৃত স্থান আয়তনে হ্রস্ব হইতেছে। একারণে ভূত্বকের কতক কতক অংশ অবলম্বন হীন হইতেছে, অর্থাৎ অধঃস্থ কোন সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। ভূত্বক স্তরে স্তরে গঠিত হওয়ায় উপরি উক্ত কারণে অর্থাৎ নিরবলম্বন অবস্থায় যখন দুই একটী স্তর ভগ্ন হইয়া যায়, তখনই ভূমিকম্প হয়। আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের সময়ও ভূকম্প হইয়া থাকে।

ভূকম্প প্রায়ই অল্পকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে যে সকল ঘটনা যুগপৎ সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহারই ফলে মানব মাত্রেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মনুষ্য ধূলিসাৎ হয়, কত

অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব বিপৎপাৎ হয়, কত সমৃদ্ধ দেশ, কত জনাকীর্ণ নগর, কত জীবজন্তু ও অপরিমেয় ধনরাশি, রসাতলে বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃতির এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, মানবের শক্তি কত হীন। ইহা সত্ত্বেও মানব পরস্পর ক্ষয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়।

ভূকম্প যেরূপ পার্থিব জগতের নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করে, সেইরূপ নব নব জাগতিক উৎপত্তিও প্রদর্শিত করে। তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রকূল সততই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ভূকম্পের নষ্টোদ্ধারিকা শক্তি দ্বারা নব নব ভূমিখণ্ড সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছে, পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের ক্ষয় কারিনী শক্তি অধিক দৃষ্ট হয়, সুখের বিষয় আগ্নেয় গিরিগুলি প্রায় তথায় অথবা দ্বীপ গুলির সন্নিহিত। প্রশান্ত উপসাগরে আগ্নেয় গিরিগুলি জাপান হইতে দক্ষিণ দিকে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে ভূকম্পের দ্বারা একস্থান উন্নত হয় এবং অন্যস্থান অবনত হয়। এই নিয়ম দ্বারা ভূভাগের পরিমাণের সমতা রক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি প্রদেশে যখন ভূকম্প হয় তখন ঘটনার পর দেখা গিয়াছিল, যে সংক্ষুব্ধ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত উপকূলের সন্নিহিত সমুদ্রের জল দূরে অপসৃত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্বর্ত্তী কচ্ছ দেশের কতকাংশ উন্নত ও অবনত হইয়াছিল। সিন্ধু নদ যথায় সমুদ্রে পতিত হইয়াছে তথাকার বালুকাস্তর অবনত হওয়ায় অর্ণবপোতের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই অধোগতির সহিত যুগপৎ সিন্ত্রী নামক স্থানের নিকটে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ১৬ মাইল প্রস্থ একটী স্থান উন্নত হইয়া অধুনা "আল্লার বাঁধ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে (১৮৯৭ খৃঃ) ১৩০৭ সালের ভূকম্প বহু লোকের মনে জাগরুক থাকিবে। ১৮৬৯ ও ১৮৮১ সালের ভূকম্প অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ভূকম্প অতিশয় ভয়ঙ্কর। শিলং, কামরূপ, ময়মনসিংহ, রংপুর

ইত্যাদি নানা স্থানে ইহার অতিশয় প্রকোপ অনুভূত হইয়াছিল। এই ভূকম্পের বিস্তৃতি এত অধিক যে জগতের মধ্যে এই ভূকম্প অতিশয় প্রচণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তখন সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে, অনেক বাড়ীতে বিবাহের দরুণ লোকজনের সমাগম, কত বালক সহপাঠীর সহিত বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছে, কত নব দম্পতির ফুলশয্যার আয়োজন হইতেছে, কত ব্যবহারজীবী ও মসীজীবী তখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই, কত গৃহিনী বাটীর কর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,এমন সময় হঠাৎ কম্পন ও বজ্রের গভীর নাদ আরব্ধ হইল, শঙ্খধ্বনি শুনা গেল, সকলেই বুঝিল সাধারণ ভূকম্প। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তেই স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি অনেকেই হারাইল, কেহ রাস্তায় কেহ ঘাটে, কেহ মাঠে, কেহ গৃহে, যে যেখানে ছিল, বসিয়া পড়িল। নিতান্ত আত্মীয় ও আত্মীয়ার কথা কাহার কাহার মনে পড়িল, অমনি চক্ষে জল আসিল, অমনি আর্ত্তনাদ, অমনি নিজ প্রাণরক্ষার চেষ্টা, সকলই যুগপৎ দৃষ্ট হইল। মত্তব্যক্তির ন্যায় দেওয়াল ধরিয়া টলিয়া পড়িতে পড়িতে কেহ বা বাটীর বাহিরে আসিল, কেহ বা গৃহের সহিত ভূমিসাৎ হইল। ক্ষণিকের মধ্যে অসম্ভব পরিবর্ত্তন, কেহ বা উৎকণ্ঠাযুক্ত, কেহ বা হত চেতন, কেহ বা মৃত—পুরাতন কথার দুই একদিন্ আন্দোলন চলিল, যাহার গেল তাহার আর ফিরিল না। ও দিকে নূতন কথা শুনা গেল। স্থানে স্থানে বালুকা সংযুক্ত জলের উৎস উঠিয়াছিল, গারো ও খাসিয়া পাহাড়ের পদতল-ভূমি সরিয়া গিয়া খাত হইল, এবং অনেক খাতভূমি উত্থিত হইল। প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা! “একদিকে লোমহর্ষণ ক্ষয় অপরদিকে নষ্টোদ্ধারিকা শক্তি!

হরিশ্চন্দ্র।

পুরাকালে সূর্য্যবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মপ্রাণ দানশীল নরপতি অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। তদীয় মহিষী, সোমদত্তের কন্যা শৈব্যা ও পুত্র রুহিদাসের সহিত নৃপবর অতিসুখে প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার দান ধ্যানে তৎকালীন সকলেই চমৎকৃত হইত। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বামিত্র নামে এক মহাতেজা মুনি বাস করিতেন। তাঁহার সুরম্য তপোবন হইতে অনধিকার পূর্ব্বক ফলাহরণ, পুষ্পচয়ন ও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধ বশতঃ একদিন শাপ দিয়াছিলেন, যে, যে কেহ পুনরায় ঐরূপ কার্য্য করিবে তাহার হস্তে লতার বন্ধন লাগিবে। পরদিন দেবরাজ ইন্দ্রের শাপভ্রষ্টা পঞ্চকন্যা পূর্ব্ববৎ উৎপাৎ করিতে আসিলে পর তাহাদের হস্ত লতায় বদ্ধ হইয়া গেল। তাহারা বন্ধন হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে না পারিয়া "মহারাজ আমাকে মুক্ত করুণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া কারণে বহির্গত হইয়া তপোবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হয়েন, এবং সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহারাজ তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, পঞ্চ কন্যা লতার বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাহারা মুক্তি লাভ করিল এবং স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কন্যাগণকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধ্যানে অবগত হইলেন যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। অনন্তর মুনিবর রাজাকে এইরূপ মুক্তি প্রদান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহারাজ যথাবিধি পাদ্যার্ঘ্যের দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিলে পর

মুনিবর তাঁহাকে আগমন কারণ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রার্থীকের প্রার্থনাপূরণ, পরের উপকারসাধন, আর্ত্তের দুঃখনিবারণ ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বলিয়া নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ দাতা তাহাও এরূপ ভাবে ব্যাক্ত করিলেন যে তাহাতে তাহার রজোগুণের প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহা সমর্থন করিতে তিনি আরও এরূপ ভাব জানাইলেন যে মুনিবর যে কোন ধনসম্পতি প্রার্থনা করিবেন, রাজা তাঁহাকে তৎসমস্ত দিবেন। ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বামিত্র ঐহিক সম্পত্তির নশ্বরত্বে মহারাজের দৃষ্টিহীনতা অনুভব করিয়া এবং মহারাজ দান পুণ্য করেন ও সেই নিমিত্ত অহঙ্কার করেন জানিয়া, রাজাকে বলিলেন যে, “আমি যাহা প্রার্থনা করিব অঙ্গীকার করুণ তাহাই আমাকে দিবেন।” রাজা স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে রাজাকে অঙ্গীকৃত করাইয়া তিনি সসাগরা রাজ্য প্রার্থনা করিলেন, এবং রাজাও সমস্ত রাজ্য মুনিবরকে দান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন “ রাজন্ যদি সমগ্র রাজ্য দান করিলেন, তবে এখন ইহার দক্ষিণা স্বরূপ সাত কোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন।” মহারাজ ভাণ্ডারীর প্রতি সাত কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিবার আজ্ঞা করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন “আমাকে অগ্রে সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছেন এখন আপনার আর ভাণ্ডারের ধনসামগ্রীতে কোন অধিকার নাই।” রাজা সমস্তই বুঝিলেন এবং মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখন হইতে তাহার বাসস্থান কোথায়? মুনিবর কহিলেন “বারাণসী ক্ষেত্র পৃথিবীর বহির্ভাগে অবস্থিত। আপনি সেস্থানে গিয়া থাকিতে পারেন।” তখন হরিশ্চন্দ্র নিকটে এক কপর্দ্দকও নাই দেখিয়া ভীত হইলেন এবং শৈব্যার সহিত পরামর্শ করিয়া শৈব্যা এবং রুহিদাসকে লইয়া দক্ষিণা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে হাটে বিক্রয় করিতে গমন করিলেন। পরে এক ব্রাহ্মণের নিকটে শৈব্যাকে বিক্রয় করিলেন। ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে লইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া রুহিদাস নিজ মাতার অঞ্চল ধরিয়া

মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। শৈব্যা পুত্রের কাতর ক্রন্দনে, অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "আমার খাদ্যের অর্দ্ধেক দুইজনে ভাগ করিয়া লইব।" ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ দুইজনকে লইয়া চলিয়া গেল। কিছু দিন পরে রুহিদাস ব্রাহ্মণের পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহার আহারের ভার গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়াও দক্ষিণার সমস্ত পূরণ হইল না দেখিয়া, নিজেকে এক হাড়ির নিকট বিক্রয় করিলেন। এবং সেই অর্থ দ্বারা মুনির দক্ষিণা পরিশোধ করিলেন। তিনি হাড়ির গৃহে শূকর চরাইতেন ও শ্মশানের কর আদায় করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে রুহিদাস প্রত্যহ তাহার পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতে বিশ্বামিত্রের তপোবনে গমন করিতেন এবং বালক সুলভ চাপল্যের পরবশ হইয়া শাখা ভগ্ন করিতেন ও পুষ্প সকল দলিত করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবনে আগমন করিলেন এবং বৃক্ষশাখা সকল ভগ্ন দেখিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "এইবার যে পুষ্প চয়ন করিতে আমার তপোবনে আগমন করিবে, তাহার বক্ষস্থলে সর্প দংশন করিবে।" অবশেষে তাহাই ঘটিল। রুহিদাসও পুষ্পচয়ন করিল এবং সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মহারাণী শৈব্যা ব্যাকুল হইলেন, এবং ব্রাহ্মণকে কহিলেন 'এত বিলম্ব হইল, এখনও রুহিদাস পুষ্প লইয়া আসিল না, কখন দেবতার পূজা করিবেন"। "আমি তাহাকে দেখিয়া আসি" বলিয়া শৈব্যা বিশ্বামিত্রের তপোবনে গমন করিলেন এবং তথায় বৃক্ষতলে সর্পদষ্ট পুত্রকে পতিত দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতিবিরহ কাতরা সহায়সম্পদবিহীনা, রাজরাণী শৈব্যা পাষাণবৎ কঠিন হইলেন, অশ্রু সলিল অন্তরে বহিতে লাগিল। স্বীর

পাদবিক্ষেপে দেহসৎকারের নিমিত্ত শ্মশানাভিমুখে চলিলেন। কতবার ভাবিলেন "ধন্য জীবনস্পৃহা, ধন্য পরকালভীতি, এখনও আত্মঘাতিনী হইতে পারিলাম না"। এখনও হৃদয়ে আশা, যদি কখন নরেন্দ্রবাঞ্ছিত পতির সাক্ষাৎ পাই, ত অযত্ন হেতু প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। সন্তানের মৃত্যুতে মাতা, নিজ দোষই তাহার কারণ এই ভাবিয়াই নিতান্ত কাতর হয়েন, দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটনাক্রমে হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশানে কর আদায়ের নিমিত্ত প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় বারংবার যাচঞা ও পরে রুষ্টভাবে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। রমণীহৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। কপর্দ্দকহীনা শৈব্যা কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে "কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আর সহ্য হয় না" বলিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, প্রিয়তমা শৈব্যার প্রতিমূর্ত্তি মানসচক্ষে পরিস্ফুট হইল, অতীতের জাজ্বল্যমান চিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থা ক্ষণিকের মধ্যে অনুধাবন করিয়া বজ্রোচিত গভীর হৃদয়ও উদ্বেলিত হইল, মর্ম্মজ তরঙ্গাভিঘাতে হৃদয় ভগ্ন হইল। তথাপি অতি স্থির ও অতি গম্ভীরভাবে তিনি রুহিদাসের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া শৈব্যাকে আত্ম-পরিচয় দিলেন। ভীত-চকিত শৈব্যা সংসারের ব্যবহারে নিত্য সন্দিগ্ধ বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের প্রতি অনিমেষ-লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার ললাটে ধ্বজ চিহ্ন দেখিয়া সন্দেহের কটাক্ষ স্নেহের চাহনিতে পরিণত হইল, কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল। উভয়ের কাতর ক্রন্দনস্রোতঃ বিস্তৃত হইয়া বিশ্বামিত্রের কঠিন হৃদয় বিগলিত করিল। ওদিকে ধর্ম্মরাজ আসিয়া রুহিদাসের প্রাণ দান করিলেন। ইতঃপূর্ব্বকার হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দাবদাহের দাহিকা শক্তি আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হইয়া গেল। অযোধ্যার প্রজাপালন যেন তুলনায় অধিকতর সুখকর বলিয়া বোধ হইল। রুহিদাসকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণকামনা, তাঁহার অতিশয় বলবতী

হইল। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাতের কারণ তিনি অচিরে ভুলিয়া গেলেন। স্বর্গপথে দেবর্ষি নারদের নিকট আত্ম-গরিমা প্রদর্শন করায় স্বর্গারোহণ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।

ধ্রুব।

বহুকাল পূর্ব্বে উত্তানপাদ নামে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার দুইটী মহিষীর মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম সুরুচি ও কনিষ্ঠার নাম সুনীতি। রাজা সুরুচিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তিনি যেরূপ করিতে পরামর্শ দিতেন, রাজা তাহা অবিচারিত চিত্তে সম্পাদন করিয়া সুখী হইতেন। এ কারণে সুরুচির পুত্র উত্তমও রাজার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নীর উপর সচরাচর লোকে যেরূপ অনুরক্ত হয়েন রাজা সুনীতির প্রতি তাদৃশ অনুরাগ দেখাইতেন না। এই সুনীতির গর্ভে মহাত্মা ধ্রুবের জন্ম হয়। একদা মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং তদীয় প্রিয়-পুত্র উত্তম তাঁহার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে, এরূপ সময় ধ্রুব, পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার উপক্রম করিল। রাজ-মহিষী সুরুচি সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং রাজাও সেই কারণে ধ্রুবের আশা পূরণ করিতে পারিলেন না। সুরুচি ধ্রুবের ইচ্ছা অবগত হইয়া ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ধ্রুব, তুমি কি জাননা যে, তুমি সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই যে, এরূপ ইচ্ছা করিতে পার? এ সিংহাসন উত্তমেরই যোগ্য"। বিমাতার এরূপ ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া, ধ্রুব যারপরনাই ব্যথিত হইলেন, এবং নিজ মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে ও অভিমানে তাঁহার অধর

ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে সুনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্রুব তোমার এইরূপ ক্রোধের কারণ কি, তোমাকে কি কেহ সমাদর করে নাই, না তোমার নিকট কেহ মহারাজের অবমাননা করিয়াছে? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" অনন্তর ধ্রুব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমাতার নির্ম্মম ব্যবহারের সকল বৃত্তান্ত নিজ মাতার নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। সুনীতি কাতরবচনে কহিলেন, "ধ্রুব তোমার অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ, তাহা তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু তুমি এ তিরস্কার বাক্যে দুঃখিত হইও না।" ধ্রুব বলিলেন," জননি, সান্ত্বনা বাক্যে আমার আর মন স্থির হইতেছে না, আমাকে বলিয়া দিন কি প্রকারে আমার মন সুস্থির হইবে।" সুনীতি ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধ্রুব, তুমি দয়াময় হরিকে সাধনা কর, তা হলে তিনি তোমায় শ্রেষ্ঠপদ দিবেন।" ধ্রুবের মনে হরির চিন্তাই দিবারাত্র উদিত হইতে লাগিল, তিনি জননীকে বলিলেন, "আমি পদ্মপলাশলোচন হরিকে সাধনা করিব।" এই বলিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, সপ্তজন মহর্ষি কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি তাঁহাদের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি রাজা উত্তানপাদের পুত্র রাজা, ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাহি না, যেস্থান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা পূর্ব্বে, কেহ কখন প্রাপ্ত হন নাই, আমি তাহারই প্রার্থী।" মহর্ষিগণ বলিলেন, "রাজকুমার, হরির আরাধনা ব্যতীত কেহই শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন নাই। বৎস, এখন তুমি সেই বিশ্বপতির সাধনা কর, তাহা হইলে তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর ধ্রুব প্রীতমনে ঋষিগণের চরণবন্দনাপূর্ব্বক যমুনাতটবর্ত্তী পবিত্র মধুবনে উপনীত হইলেন। ধ্রুব ঐ বনে প্রবিষ্ট হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবং ঋষিগণের উপদেশ ক্রমে দুরূহ সাধনা করিতে লাগিলেন। ইতঃ মধ্যে উপদেবতা সকল কত না ছলনা করিতে লাগিলেন। কেহ বা

সুনীতির রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ধ্রুব, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন তোমারই মুখপানে চাহিয়া আছি, তুমি আমার দুধের ছেলে, কি প্রকারে এই অসহ্য কঠোর তপস্যা সহ্য করিবে।" তথাপি ধ্রুবের মন সেই সকল ছলনা বাক্যে বিচলিত হইল না। তিনি একতানমনা হইয়া পদ্মপলাশলোচন হরির ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। কাহার সাধ্য তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে।

ধ্রুবের এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং দেবাদিদেব হরির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমরা পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের কঠোর সাধনায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে তাহাকে নিবৃত্ত করুন। তাহাতে চরাচরগুরু হরি কহিলেন, "দেবগণ, আপনারা নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে গমন করুন। আমিই সেই বালককে বিরত করিব।" তৎপরে পদ্মপলাশলোচন হরি ধ্রুবের নিকটে গিয়া স্নিগ্ধ ও মধুর বচনে কহিলেন, "বৎস, আমি তোমার তপস্যায় মুগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে যাহা অভীষ্ট তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ধ্রুব নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পদ্মপলাশলোচন হরি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি হর্ষে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে কহিলেন, "ভগবন্, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট এই যে, আমাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করুন, অর্থাৎ যাহাতে আমি আপনার স্তব করিতে পারি, এই বর প্রদান করুন"। ভগবান হরি কহিলেন "পূর্ব্বজন্মে তোমার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হইবার ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছার ফলে তুমি উত্তানপাদ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, স্বর্গাদিপদ ত সামান্য কথা, আমি তোমাকে জ্যোতিষ্ক

মণ্ডলের * উপরিতম স্থান প্রদান করিলাম"। বরলাভে কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উত্তানপাদও সন্তুষ্ট হইয়া উত্তমকে না দিয়া ধ্রুবকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। এরূপ একাগ্রতা ও ভগবৎ ভক্তি না থাকিলে সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ধ্রুব কি ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারিতেন ?

একলব্য।

পুবাকালে ভাবতবর্ষে ভবদ্বাজেব দ্রোণাচার্য্য নামে এক পুত্র ছিল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত্রবিদ্যায ও ব্যাযাম শিক্ষা কার্য্যে তদানীন্তন লোকেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয বলিযা গণ্য করিতেন। এ কাবণে কুরু-পাণ্ডবদিগের পিতামহ ভীষ্মদেব তাঁহাকে বালকদিগের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাব জন্য নিযুক্ত কবিযাছিলেন। একদা দ্রোণাচার্য্য কুরু ও পাণ্ডুপুত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান কবিতেছেন, এমন সময একটি বালক আসিযা তাঁহাব চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন কবিল "আমি নিষাদ হিরণ্যধনুব পুত্র। আমার নাম একলব্য, আপনাব নিকটে অস্ত্র শিক্ষা লাভের আশায অনুপ্রাণিত হইয়া আসিযাছি।" আচার্য্য দ্রোণ তাহাব কথা শ্রবণ করিযা কহিলেন "তুমি নীচ ব্যাধজাতি, তোমাকে শিষ্য বলিযা গ্রহণ করিলে আমার অখ্যাতি হইবে।" একলব্য অনেক অনুনয বিনয কবিল, দ্রোণাচার্য্য কিন্তু কোন প্রকাবে সম্মত হইলেন না। মনেব দুঃখে একলব্য দ্রোণের চরণে প্রণাম কবিযা হতাশ হৃদয়ে গভীর নিবিড় কাননে প্রবেশ কবিল।

নিষাদ নন্দন নিষাদোচিত বেশ ত্যাগ করিযা ব্রহ্মচারী হইলেন,

---

* ধ্রুবতারা।

এবং জটাবল্কল পরিধান করতঃ বনমধ্যে মৃত্তিকার দ্রোণমূর্ত্তি রচনা করিয়া ধনুঃ ও শরহস্তে পুষ্পমাল্য অর্ঘ্য দিয়া সেই মূর্ত্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে তাবৎ মন্ত্র ও অস্ত্র শিক্ষা করিয়া ধনুর্দ্ধর হইলেন।

কিছুকাল পরে কুরু-পাণ্ডব রাজকুমারেরা মৃগয়া কারণ সারমেয় সহিত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগের কুকুরটি মহাশব্দ করিয়া একলব্যের ধ্যান ভঙ্গ করিল। নিষাদ-পুত্র রাগান্বিত হইয়া তাহার মুখে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কুকুরের মুখে আঘাতও লাগিল না, তাহার জীবন নাশও হইল না, কিন্তু তাহার শব্দ করিবার ক্ষমতা বন্ধ হইল। কুকুর বন্য পশু অন্বেষণ করিতে না পারিয়া স্বীয় প্রভুগণের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং তাহার মুখে শব্দভেদী শর বিদ্ধ দেখিয়া তাহার প্রভুগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন "আমরা বহুবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি বটে, কিন্তু ধনুর্বিদ্যার এরূপ অদ্ভুত প্রভাব কখন দর্শনও করি নাই এবং শ্রবণও করি নাই। এই বলিতে বলিতে তাহারা লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভ্রাতৃবৃন্দ ও অনুচরবর্গের সহিত, যে ব্যক্তি এই প্রকার শর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিলেন। ঘনগম্ভীর বনমধ্যে তাহারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এক ব্রহ্মচারী শরধনুঃ হস্তে লইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। যুবক যোগিবরকে দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন্ মহাজন—কাহার পুত্র—কি নাম ধরিয়া থাকেন—এবং কাহার নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন?" নিষাদ-নন্দন তদুত্তরে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আমার নাম একলব্য, আমি নিষাদ হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্য আমার গুরু, এবং তাহারই নিকট আমি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি" রাজকুমারেরা এই বাক্যে বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট

উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "গুরুদেব, পার্থের সমান প্রিয়তম শিষ্য আর কাহাকেও করিবেন না এবং কেহই আপনার সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না, বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনার এ সমস্ত ছলনামাত্র। আপনি এক নিষাদ পুত্রকে অদ্ভুত বিদ্যা দান করিয়াছেন, এ কথা আপনার সেই শিষ্যের নিকটেই আমরা অবগত হইলাম।" দ্রোণাচার্য্য এ কথার তাৎপর্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত সত্বর সেই বনে প্রবেশ করিলেন। একলব্য দ্রোণাচার্য্যকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহার নিকট এরূপ একাগ্রতা সহকারে এ জাতীয় অদ্ভুত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ?" একলব্য উত্তর করিল "আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, জাত্যংশে নীচ বলিয়া আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপনি অস্বীকৃত হয়েন এ কারণে আমি মৃত্তিকায় আপনার মূর্ত্তি রচিত করিয়া তৎসমক্ষে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আজ্ঞাধীনের নাম একলব্য। দ্রোণাচার্য্য এই বালকের অদ্ভুত একগ্রতায় বিস্মিত হইলেন এবং অনেক চিন্তার পর রাজকুমারদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া, একলব্যকে বলিলেন, "গুরু-দক্ষিণা প্রদান না করিলে কোন বিদ্যাই সম্পূর্ণ হয় না। তুমি আমার দক্ষিণা সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিয়াছ"? একলব্য আনন্দিতচিত্তে কহিলেন, "আপনার দর্শনলাভে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, যথাসাধ্য দক্ষিণাস্বরূপ তাহাই অর্পণ করিয়া আমার শিক্ষা সফল বিবেচনা করিব, এবং এতদিন পরে আপনার প্রকৃত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইব"। অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করিবার মানসে তিনি একলব্যকে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র একলব্য শাণিত ছুরিকাদ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলী ছেদনপূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিয়া উহা

গুরু-পাদপদ্মে দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করিলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্য এবং স্বার্থপর জগৎও বিস্ময়ে বিহ্বল হইল—তাহারা কিছুকালের নিমিত্ত নিজচক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। এতাদৃশ গুরুভক্তিও একাগ্রতা জগতে বিরল।

নল দময়ন্তী।

পূর্ব্বকালে নিষধরাজ্যে নল নামে এক রূপবান্, গুণবান্, যশস্বী ও তেজস্বী নরপতি ছিলেন। তৎকালে বিদর্ভরাজ্যে ভীম রাজার এক নানাগুণসম্পন্না রত্নস্বরূপা পরম রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম দময়ন্তী। এই অলোকসামান্যা রাজকন্যার ত্রিভুবন-বিদিত-রূপরাশি ও গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া পত্নীরূপে তাহাকে পাইবার নিমিত্ত নিষধরাজ যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, লোক মুখে কন্দর্প বাঞ্ছিত নলরাজের রূপ ও নানাবিধ গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীও সেইরূপ মনে মনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইতেছিলেন। দময়ন্তীর চিন্তায় অধীর হইয়া মহারাজ নল একদিন স্বীয় প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুবর্ণহংসী দেখিতে পাইলেন। নল এই হংসীটিকে অশেষ চেষ্টায় হস্তগত করিলে পর, হংসী ভীত ও চকিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় বাক্যে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমাকে মুক্ত করুন আমি দময়ন্তীর সমীপে আপনার ত্রিভুবনবিদিত রূপ ও দেবতাবাঞ্ছিত গুণের কথা বলিয়া আপনার সহিত বিদর্ভ রাজকন্যার মিলন ঘটাইয়া দিব।" মহারাজ নল তাহার এই আশ্বাস-বাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া মুক্ত করিবামাত্র, হংসী আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া বিদর্ভনগরে ভীমরাজের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্যানে গমন করিল।

রাজকন্যা তৎকালে সঙ্গিনীগণ পরিবৃতা হইযা পুষ্পচয়ণ করিতেছিলেন। অনন্তর সরোবর সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি সুবণ হংসী জলে সন্তরণ কবিতেছে দেখিতে পাইলেন। এইরূপ সুন্দর পক্ষী দেখিয়া তিনিও নলরাজের ন্যায পুলকিত চিত্তে সরসীজলে অবতীর্ণ হইয়া হংসেব নিকটবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় হংসী পূর্ব্ববৎ মনুষ্যেব স্ববে বৈদর্ভীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "রাজকন্যা আমাকে ধবিবেন না। ত্রিভুবনে নিষধরাজ নলই আপনাব ন্যায় রূপবতী ও গুণবতীর পাণি-গ্রহণ করিবাব উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সহিত আপনাব মিলন ঘটাইযা দিব।" পূর্ব্ব হইতে নলেব প্রতি আকৃষ্টচিত্ত দমযন্তী, হংসীর এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিযা, তখনই মনে মনে নলবাজকে পতিরূপে বরণ কবিলেন।

কন্যাকে বিবাহেব উপযুক্ত দেখিযা বিদর্ভমহিষী স্বামীর নিকট কন্যার বিবাহেব নিমিত্ত বারংবাব প্রস্তাব করিলেন। বিদর্ভবাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইযা বাজকন্যাব স্বয়ম্বর বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, এবং দেশ দেশান্তবে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলেন। দেবগণের নিকটেও এ সংবাদ পৌঁছিল। নিমন্ত্রনবার্ত্তা পাইযা নানা দেশের নরপতিবৃন্দ স্বয়ম্ববাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং মহারাজ নলও সসৈন্যে সুবর্ণ চতুর্দ্দোলায আবোহণ কবিয়া স্বযম্ববস্থলে আগমন কবিতেছেন এরূপ সমযে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই দেবতা চতুষ্টযের সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেবতাবা মানবীব স্বযম্বরে আগমন কবিতেছেন, এস্থলে দমযন্তী যদি তাঁহাদেব মধ্যে কাহাকেও বরমাল্য প্রদান না কবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেব অপমানেব সীমা থাকিবে না। এই আশঙ্কা করিযা তাঁহারা দমযন্তীর নিকট নলরাজকে দূতরূপে প্রেরণ করিবেন, স্থির করিযা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং নলরাজও দৌত্য কার্য্যে স্বীকৃত হইয়া দময়ন্তী যাহাতে

কোন দেবতাকে বরণ করেন, একথা প্রস্তাব করিতে যাত্রা করিলেন। দেবমায়ায় নলরাজ অলক্ষিতে রাজ-অন্তঃপুরে দময়ন্তী গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তদুত্তরে দময়ন্তী বলিলেন যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বেই নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। বৈদর্ভীর মুখে নলরাজ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরে দেবগণ সমীপে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দেবতারা দময়ন্তীর অবহেলায় রুষ্ট হইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন এবং সকলেই নলের রূপ ধারণ করিলেন। যথা সময়ে বরমাল্য হস্তে লইয়া বিদর্ভরাজকন্যা স্বয়ম্বর স্থলে উপনীত হইয়া পঞ্চনলের মধ্যে যথার্থ নলকে নির্ব্বাচন করিতে পরিলেন না। তাঁহার চিরপোষিত নল লাভের আশা বিফল হইল। তিনি উপায় না পাইয়া স্থিরচিত্তে দেবগণের আরাধনা করিয়া তাঁহাদিগের কৃপাভাজন হইলেন। নল রূপধারী দেবতারা এইবার স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং দময়ন্তী নলরাজকে বরমাল্য প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবগণ নলকে চারিটী বর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে যতদূর ইচ্ছা তথায় একদিনে গমন এবং বিনা কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বালনই প্রধান।

দেবতারা স্বীয় স্থানে গমন করিতেছেন এরূপ সময়ে তাঁহারা পথিমধ্যে দ্বাপর ও কলিকে স্বয়ম্বরাভিমুখে আসিতে দেখিলেন। দময়ন্তী দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানবকে বরণ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া দুষ্ট দেবতা কলির অত্যন্ত হিংসা ও ক্রোধ সঞ্জাত হইল। কলি ও দ্বাপর দুই জনেই পরামর্শ করিয়া নলের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। একদা মহারাজ নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করিয়াছিলেন এই ছিদ্র পাইয়া কলি তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং নলের এক কূটবুদ্ধি সম্পন্ন পুষ্কর নামক ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে নলকে পাশা খেলায় আহ্বান করিলে তিনি তাহার সহায় হইবেন এবং নল

ঐ ক্রীড়ায় রত হইলে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। কলি-আশ্রিত নল অক্ষক্রীড়ায় ধনের পর ধন পণ করিয়া পরাজিত হইতে লাগিলেন। কলির প্রভাবে তিনি পাশা খেলায় এরূপ আসক্ত হইলেন যে অবশেষে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। স্বীয় সাম্রাজ্য মধ্যে সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। নলের ঈদৃশী অবস্থা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী দময়ন্তী পুত্র কন্যাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

অনন্তর পুষ্কর রাজ্য লাভ করিয়া এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নগরস্থ যে কেহ তাঁহাদের আশ্রয় দান করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। আশ্রয়হীন নলরাজ স্বীয় মহিষীর সহিত যাইতে যাইতে রাণীকে ক্লান্ত ও ভাবনায় অভিভূত দেখিয়া বনমধ্যে বিশ্রামের নিমিত্ত একটী স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন। তথায় কতকগুলি বিহায়সের বিচিত্র পক্ষ অবলোকন করিয়া সেইগুলি ধরিবার নিমিত্ত এবং দময়ন্তীকে অন্যমনা করিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন। পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া পক্ষীগুলির উপর তাহা নিক্ষেপ করিবা মাত্র বিহঙ্গকুল বিহায়সে বস্ত্রসহ উড্ডীন হইল এবং যাইতে যাইতে প্রকাশ করিল যে, তাহারা কলি কর্ত্তৃক প্রেরিত। "নিষধরাজের দুর্গতির অবধি দেখিবার নিমিত্ত আমরা বস্ত্র পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছি।" দময়ন্তী কলির এই উক্তি এবং নিষধ রাজের নগ্ন বেশ অবলোকন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং স্বীয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ দিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। রাজা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ প্রাণসমা দময়ন্তীর পর্য্যটনক্লেশ এবং প্রাসাদের সুখতপ্ত শয্যায় অভ্যস্তা এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যাদি উপভোগে চিরপালিতা রাজমহিষীর অনশনক্লেশ, স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া,

রাজা বিষাদে ব্যথিত ও বিমূঢ় হইলেন। দুইজনে কলি চক্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে স্থান লইলেন এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে অভিভূত হইয়া দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলেন। মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা পরম্পরা ও প্রাণান্তকর প্রতীপ প্ররোচনায় প্রাণপ্রিয়ার মত প্রিয়তমের নিদ্রা আসিল না। একের নিদ্রা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নিঃশঙ্কার সুখময় ফল—অপরের জাগরণ অসহনীয় আবেগ ও কর্ত্তব্যের সমাধান। এ জাগরণে সুখ ত ছিলই না, অধিকন্তু একাকী নানারূপ চিন্তায় ও ঘটনাচক্রে মহারাজ নলের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল; তিনি দময়ন্তীকে নিদ্রিতা দেখিযা বিশ্বাস ঘাতকের ন্যায ভর্ত্তাব ভাব বনপাদপের উপব ন্যস্ত করিয়া বস্ত্রার্দ্ধ ছিন্ন কবতঃ পলাযনপব হইলেন। দোলার ন্যায় একবার যাইতে চেষ্টা করিলেন, আবাব ফিবিলেন। এইরূপ কবিতে করিতে কলিব প্রাধান্য তাঁহাব মনোমধ্যে বিস্তৃত হইল এবং নলবাজ প্রাণপ্রিযাব প্রতি দুই একবাব ফিরিতে ফিবিতে অস্তাচল গমনোন্মুখ দিবাকরেব ন্যায অতি সত্বব অদৃশ্য হইলেন।

সুপ্তোত্থিতা বাজমহিষী হৃদয়ববির অদর্শনে চতুর্দ্দিক অন্ধকাবময দেখিলেন। কতবার ভাবিলেন প্রাণনাথ বুঝি কৌতুকচ্ছলে মেঘের অন্তবালে আছেন এবং অতি সত্বরই তাঁহার মেঘনিঃসৃতবশ্মিমালা অবসন্নহৃদয়ে নবীন তেজঃ সঞ্চাবিত করিবে—কতবাব সন্দেহ হইল—কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, হৃদযবাজ স্বীয় রাজ্যের ধ্বংস সাধন কবিযা অন্যত্র চলিয়া গিযাছেন। তরুতল, পুষ্করিণী ও অন্যান্য স্থান তন্ন তন্ন করিযা অন্বেষণ কবিলেন এবং অবসাদের অকূল-আবর্ত্তে নিমগ্না হইলেন। কিযৎক্ষণ পবে এক অজাগব সর্প তাহাকে দংশন কবিতে উদ্যত দেখিযা তাহাব প্রাণে ভীতি সঞ্চারিত হইল। এক ব্যাধ তখনই উহার সংহাব করিল। রাজমহিষী অমনি বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং ব্যাধকে

অভদ্র বিবেচনা করিয়া পশ্চাদাগত একদল বণিকের শরণ লইলেন। আলুলায়িত কেশা ও অর্দ্ধবস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে পাগলিনী অনুমান করিল এবং তাহাদের সহিত চেদিরাজ্যে লইয়া গেল। চেদিরাজধানীর দুষ্ট বালকেরা তাহার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি ধূলি ও কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজ প্রাসাদের উপর হইতে রাজমাতা ধূলায় ধূসর হইলেও অলোক-সামান্যা রমণীর রূপলাবণ্য অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি অচিরে লোক প্রেরণ করিয়া সেই অসামান্য-রূপবতীকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে সখীভাবে আশ্রয় দান করিলেন।

বিদর্ভরাজ, জামাতা ও কন্যার ঈদৃশ অবস্থা লোক পরম্পরায় অবগত হইয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইলেন। সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চেদীরাজ্যে আসিয়া দময়ন্তীর অনুসন্ধান পাইলেন এবং ভীম রাজ সংবাদ পাইয়া কন্যাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া নল রাজের অন্বেষণ করাইলেন তথাপি কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে এক ব্রাহ্মণ ঋতুপর্ণ রাজার গৃহে নলরাজের অবস্থান নানা কারণে সম্ভবপর হইতে পারে এ কথা জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধিমতী বিদর্ভ-দুহিতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বয়ম্বরা হইবেন এরূপ কথা রটাইয়া দিয়া ঋতুপর্ণ রাজার নিকট লোক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং মনে মনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ঋতুপর্ণের সারথি যদি এক দিনে এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভুকে বিদর্ভরাজ্যে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে নিষধরাজ ব্যতীত তিনি অন্য কেহই নহেন।

মহারাজ নল ছদ্মবেশে ইতিপূর্ব্বেই ঋতুপর্ণরাজের সারথিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একমাসের পথ দময়ন্তীর স্বয়ম্বরস্থলে পঁহুছিবার একদিন মাত্র আছে জানিয়া ঋতুপর্ণরাজ নিজ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

তিনি স্বয়ম্বর স্থলে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কিনা এবং তাহার সারথির উত্তরে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। রাজা ঋতুপর্ণ এক দিবসের মধ্যেই বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ম্বরের কোন আয়োজনই দেখিতে না পাইয়া অপ্রতিভ ও বিরক্ত হইলেন এবং বিদর্ভরাজের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

দময়ন্তী অনল ব্যতীত নলের রন্ধন কার্য্য এবং অন্যান্য বিশেষগুণ দেখিয়া অচিরে ছদ্মবেশী সারথির পরিচয় পাইলেন। নলরাজও নিজ শ্বশুরালয়ে লালিত পালিত নিষধরাজের পুত্র কন্যা বলিয়া অভিহিত বালক বালিকাকে দেখিতে পাইয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কলি ক্রমে ক্রমে তাহার উপর যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পুণ্যশ্লোক নলরাজ স্বায় রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমেই পুষ্করকে ক্ষমা করিলেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সীতা চরিত্র।

বাল্মীকির সীতাচরিত্রবর্ণন লোক ও সমাজ শিক্ষার নিমিত্ত একটি আদর্শচরিত্রবর্ণন। রাজনীতি ও সমাজনীতি বিশারদ রামচন্দ্রের সীতার প্রতি ব্যবহার, যুগপৎ হিন্দু রাজার ও হিন্দু পতির প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত এবং সমাজস্থায়িত্ব রক্ষার্থ আদর্শ ব্যবহার। এবং তদীয় দয়িতা রাজর্ষি জনকের গৃহে প্রতিপালিতার প্রকৃতি রঞ্জনার্থ স্বার্থত্যাগ ও পত্নীপ্রেম উভয় চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। সীতাতে রমণীসুলভ চাঞ্চল্য, স্বামীর উপর সন্দেহ ও দোষারোপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ হিন্দু গৃহস্থ প্রাণান্তে কন্যাকে সীতা নামে অভিহিত করেন না, কারণ হিন্দু গৃহিনী মাত্রেরই বিশ্বাস

যে ঐহিক জীবনে সীতার ন্যায় অভাগিনী আর নাই। সীতা স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হইতে পারেন নাই। বিবাহের অনতিবিলম্বে কৈকেয়ীর প্ররোচনায় যুবরাজপত্নীর ভাগ্যে রাজভোগ বড় একটা ঘটে নাই। সীতা রাজকুলবধূ হইয়া ঐহিক সুখ প্রার্থনা করেন নাই, এবং স্বামীর অনুগামিনী হওয়া ও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর সহিত হাস্যবদনে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্বশুর মহাশয়কে সান্ত্বনা দিতে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। স্বামীর সহিত তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, কেবল সত্যপালনের নিমিত্ত দেবতুল্য শ্বশুর মহাশয় কৈকেয়ীর অনুরোধে এইরূপ আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত তিনি আরও স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, কৈকেয়ীর অন্তরালস্থিত অন্য কোন গূঢ় শক্তির প্রভাবে তাঁহারা অযথা ক্লেশপূর্ণ মার্গের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে সত্যের প্রাধান্য রক্ষার্থে নিজ নিজ স্বার্থে বলিদান দিয়াছিলেন। সমাজের ও সকলের নিমিত্ত নিজ স্বার্থ যে নিতান্ত মূল্যহীন, তাহা তিনি অনুভব করিতে সমর্থ ছিলেন। ঐহিক জীবনে কষ্ট পাইয়া থাকিলেও তিনি মনোজীবনে আত্মপ্রাসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, দেবতুল্য অধর্ম্মভীরু রামচন্দ্র মনে মনে কখন তাঁহাকে ঘৃণা করেন নাই। ইহজীবনে এই জীবন বিপর্য্যয় পরিস্ফুট করিতে বাল্মিকীর সীতা চরিত্র গঠন। অনেকে রমণী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিজ্ঞ ভর্ত্তার সহিত তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে জগতে এরূপ চরিত্র গঠিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না। জগতের নিমিত্ত, সমাজের নিমিত্ত, প্রজার নিমিত্ত, স্বামীর নিমিত্ত, শ্বশুরের নিমিত্ত, এবং পরিশেষে নিজ আত্মজের নিমিত্ত এরূপ স্বার্থত্যাগ এবং এক সুরে বাঁধা এরূপ চরিত্র জগতে বিরল, অননু-

করণীয়, অত্যাশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত। রামচন্দ্র রাজা হইলেও যেরূপ রাজকুলসম্রাট, সীতা রাজ্ঞী হইলেও সেইরূপ কেবল যে রমণীকুল-রাজ্ঞী এরূপ নহেন, তিনি রাজ্ঞীকুলরাজ্ঞী।

প্রকৃতির কন্যা সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুরাগিনী, এবং রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সহাস্যবদনে আপনাকে অবস্থার বশীভূত হইতে দেন নাই। তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিতে কখন কাতরতা প্রকাশ করেন নাই, বরং স্বামীকে দুঃখ ক্লেশ অনুভব করিতে দেন নাই। অধিকন্তু বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত কানন কুঞ্জ, পুষ্প, পশু, পক্ষিগণকে স্বাভাবিক অবস্থায় অবলোকন করিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইতেন। রাজর্ষিগৃহের পালিত কন্যা পরে ঋষিগৃহবাসিনী হইয়া, অপরিচিত স্থানে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি কখনই মনে করেন নাই। এই নিমিত্ত নির্ব্বাসনের আজ্ঞাপ্রাপ্তির পর শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসের আতঙ্কপ্রদ চিত্র সীতার মানসপটে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, প্রকৃতি কন্যা তখনই উহা রাজ্ঞীবাঞ্ছিত প্রিয়তম উদ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন—তখনই বলিয়াছেন যে কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা কণ্টক তাঁহার নিকট সুকোমল বোধ হইবে—তখনই বলিয়াছেন যে প্রবল বাত্যাসঞ্জাত ধূলিরাশি বৃষ্টি সংস্পর্শে তাঁহার নিকট চন্দনবৎ অনুমিত হইবে—তখনই প্রকাশ করিয়াছেন যে যোগেন্দ্রবাঞ্ছিত নদনদী, বন উপবন এবং অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবে—তখনই বলিয়াছেন যে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের অনেক দেখিয়াছেন এইবার পাতিব্রত্যের শেষ সীমা দেখিতে তিনি অভিলাষিণী। এ জাতীয় স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া যাইতে যোগিবর রাজকুলসম্রাট বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র দেখিয়া যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এখনও সীতা চরিত্রের পরীক্ষার কথা বিবৃত হয় নাই। এই

নিমিত্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং পার্থিব সুখের সমীপবর্ত্তিনী সীতার পাতাল প্রবেশ। সামান্যমনা রূপলোলুপ রাক্ষস সীতার গুণরাশির মর্য্যাদা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ রমণীপ্রিয় ধন বস্ত্র পরিচ্ছদাদির কত না প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু সেই অদূরদর্শী মূর্ত্তিমান্ লোভ একবারও চিন্তা করিল না যে, সীতা দেবী ঐ সকল নশ্বর সামগ্রীর লোভ বিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হওয়া গরীয়ান বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাই রাক্ষসজ পাপ, পবিত্র সীতা দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। তাই সীতাদেবী অশোক বনে শোক পাইলেন না। অতিশয় ভক্তি ও প্রেমের আধিক্যে তিনি প্রবাসবিচ্ছেদ অনুভব করেন নাই, কারণ আত্মার অবিচ্ছিন্ন অনুরাগে রামমূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত ছিল।

রাক্ষসপাপ অপসারিত হওয়ার পর রামচন্দ্র রাক্ষসগৃহে অবস্থান কালে রাজ মহিষীর চরিত্র সম্বন্ধে পাছে অনুচরবৃন্দ সন্দেহ করে এই ভাবিয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা করেন। কিন্তু অগ্নি অগ্নিকে ভস্মীভূত করিতে পারিল না, সতী-ধর্ম্মেরই জয় হইল।

অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে রাজমহিষী অন্তঃসত্ত্বা হয়েন এবং অযোধ্যাবাসী অনেকেই তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিল। অযোধ্যারাজ বহুদিন পরে নিজ রাজ্যের প্রকৃতিবৃন্দকে সন্দিগ্ধচিত্ত দেখিয়া তাহাদের সঙ্গত সকল প্রার্থনায় স্বীকৃত না হওয়া নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিলেন। এবং প্রকৃতিকন্যা সীতাদেবীকে প্রকৃতির ক্রোড়ে ঋষি আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় তাঁহার জীবনের কি সাধ আছে জিজ্ঞাসিত হওয়ার জানকী বলিয়াছিলেন যে মুনিদের আশ্রমে একদিন থাকিয়া প্রাকৃতিক বৃক্ষ দেখিবার তাঁহার বড়ই সাধ। রাজর্ষি গৃহে প্রতিপালিতা সীতা রাজধানীর আবিল তরঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঋষিগৃহের সুখশান্তি ভোগ

করা কখনই স্বভাব বিরুদ্ধ মনে করিলেন না। অধিকন্তু প্রকৃতিরঞ্জন করিতে রামচন্দ্রকে নিযুক্ত রাখিয়া, তিনি জাত সন্তানদ্বয়ের লালনপালনে নিযুক্ত রহিলেন এবং তাহাদিগকে পিতার গুণাবলীর কথা সর্ব্বদাই শুনাইতেন। পরে যখন প্রজাবৃন্দ, সীতা চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক এবং তিনি পতিভাবে রামচন্দ্র ভিন্ন যে অন্য কোন মূর্ত্তি কখন ধ্যান করেন নাই, একথা সীতাদেবী স্বয়ং শপথ করিলে পুনরায় মহিষীরূপে গৃহীত হইতে পারেন, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তখনও তিনি অভিমান করেন নাই। সীতাদেবী জানিতেন যে ইহসংসারে সামান্যমনা প্রজাবর্গের সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে এবং পরগৃহে বহুদিবস বাস করিলে সকল স্ত্রীলোকের চরিত্র পবিত্র থাকাও সম্ভবপর নহে। এ কারণে তিনি প্রজাবৃন্দের প্রস্তাব দোষাবহ বলিয়া অনুমান করেন নাই এবং অম্লান বদনে পরীক্ষায় সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সম্মুখে আসিয়া শপথ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে পত্নীরূপে, রাজমহিষীরূপে, মাতৃরূপে, ইহ জগতের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই তিনি সমাধা করিয়াছেন, তখন প্রকৃতির কন্যা প্রকৃতির ক্রোড়ে লীন হইলেন।

সমাপ্ত।

আয়েষা চরিত্র।

পরহিতের আকাঙ্ক্ষা রমণীহৃদয়ে যতদূর বলবতী হইতে পারে এবং প্রণয়ভাজনের সহিত মিলনের সম্ভাবনা না থাকিলেও রমণীপ্রেম যে কতদূর উচ্চ হইতে পারে, আয়েষা চরিত্রে কবিকল্পনায় তাহাই নিদর্শিত হইয়াছে। কবিদের চরিত্রসৃষ্টি করিবার একটী ক্ষমতা আছে এবং আয়েষা চরিত্র বর্ণন করিতে কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় সে ক্ষমতার উৎকৃষ্টতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

আয়েষা মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্ম্মে স্ত্রীলোক তালাক দিয়া ধর্ম্মে পতিত না হইয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। অধিকন্তু তাহার বাল্যসখা ধনবান্ ও বীর্য্যবান্ ওসমান তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত। এস্থলে বন্দীকৃত রাজপুত তনয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নবাবনন্দিনী আয়েষার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। তিনি জানিতেন যে রাজপুতবীর কখনই মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন না, তথাপি তিনি মনোজীবনে তাহাকে বরণ করিলেন। অতএব আয়েষাকে বিধবার ন্যায় স্বামী চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দুকবি, বঙ্গবিধবা যে উচ্চতম কল্পনার সৃষ্ট হইয়াছে, আয়েষাকে ততোধিক উচ্চতর কল্পনায় সৃজিত করিয়াছেন। বাল্মীকি পরের জন্য প্রকৃতিরঞ্জনের জন্য, সমাজের জন্য সীতাতে যে স্বার্থত্যাগ চিত্রিত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রণয়ের জন্য আয়েষাতে সে স্বার্থত্যাগ চিত্রিত করিয়াছেন। কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিতা কৃপাময়ী আয়েষা তাঁহার হৃদয়ে যে, গুণরাশির মূর্ত্তি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ ও সংস্কার নির্ব্বিশেষে পরিচালিত হইতে পারে না। এই কারণে তিনি দাম্পত্য সুখের অভিলাষ হৃদয়ে স্থান দেন নাই। এই কারণে

ধনসম্পদের অধিকারী ওসমানের প্রণয়ও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

হিন্দু-বিধবা-চরিত্র পতিসোহাগে সোহাগিনীর স্বামীর মৃত্যুর পরের চরিত্র। কিন্তু আয়েষা ত কাহাকে বিবাহ করেন নাই। দময়ন্তী মনে মনে পূর্ব্বেই নিষধরাজকে বরণ করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণ নলের রূপ ধারণ করিলেও দময়ন্তীর মানসিক বলের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। এস্থলে মানসিক বলের শ্রেষ্ঠত্বের সহিত নলপ্রাপ্তিরূপ পুরস্কার; কিন্তু আয়েষার বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রণয় ভাজনের প্রাপ্তির কোন আশা না থাকিলেও আয়েষার মানসিক বলের প্রাধান্য পরিস্ফুটিত হইয়াছে।

স্বামীর মৃত্যুতে স্বামীসোহাগিনীর বৈধব্য এক কথা, কিন্তু স্বামিত্বে বরণ করিয়া স্বামী লাভে বঞ্চিতা মুসলমান রাজকন্যার প্রণয়ের প্বতিগত এরূপ ভাবে নির্ণয় করা প্রণয়ের প্রকৃষ্ট পরিণাম প্রদর্শন। জগৎ সিংহের প্রেম হিন্দুসংস্কারাবদ্ধ, কারণ হিন্দু হইয়া তিনি মুসলমান কন্যাকে কখনই লাভ করিতে পারিতেন না জানিতেন। আয়েষার প্রেম কোন ধর্ম্মসংস্কারাবদ্ধ নহে। তাঁহার মতে সংসারে এক ব্যক্তিকেই স্বামী ভাবে চিন্তা করা যাইতে পারে। এবং ধর্ম্ম সংস্কার যদি তাহাতে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করা অধর্ম্ম। অতএব আয়েষা ও জগৎ সিংহের প্রেমধর্ম্ম বিভিন্ন।

এ কারণে মনোজীবনে পতিরূপে বৃত স্বামী যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন আয়েষার তাহাতে অভিমান নাই। তিনি জগৎ সিংহের ধর্ম্মপত্নী তিলোত্তমার প্রতি অসূয়া পরবশ হইতে পারেন নাই, কারণ অসূয়ার বিপরীত চিত্তবৃত্তি, পরোপকার প্রবৃত্তি এবং পরসুখে সুখানুভব করিবার বলবতী বাসনা, তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত ছিল।

সেই কারণে তিনি দুর্গেশনন্দিনীকে বিবাহকালে অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা করিয়াছিলেন এবং তদবধি, পাছে নারীমনের দুর্ব্বলতার বশীভূত হইতে হয় বলিয়া, তিনি দূরে দূরে রহিলেন।

তথাপি আয়েষা দেবী নহেন। মনুষ্যের যে ভ্রমাত্মক অভিমান হয় আয়েষা একদা সেই অভিমানের পরবশ হইয়াছিলেন। তিনি জগৎ সিংহের পরিণয় সময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাতে দেবী ভাবের আধিক্য, অথবা সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন ভাব বর্ত্তমান থাকায়, তিনি নিজভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং জীবনের মহৎ সঙ্কল্পের ছবি মানস পট হইতে ম্লান হইতে দিলেন না। এই কারণে বিষাঙ্গুরীয় তিনি নদী জলে নিক্ষেপ করিলেন, দূরে থাকিয়া প্রণয়ভাজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন এবং জগৎ সিংহের নিকট ভালবাসার প্রতিদান প্রত্যাশা করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের সুখের নিমিত্ত সীতাদেবীর স্বার্থত্যাগ এবং প্রণয়ভাজনের সুখের নিমিত্ত আয়েষার স্বার্থ ত্যাগের তুলনা করা উচিত নহে, কারণ একজন বিবাহিতা অপর জন কুমারী। কাদম্বরী প্রণেতা মহাশ্বেতাকে পুণ্ডরীকের অদর্শনে তপস্বিনী রাখিয়াছেন কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রণেতা আয়েষাকে প্রাসাদস্থ নবাবনন্দিনী রাখিয়াছেন। পুণ্ডরীককে লাভ করিবার আশা মহাশ্বেতার অন্তর হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় নাই. কিন্তু মুসলমান রাজকন্যার হিন্দুরাজপুত্র লাভের কোন আশাই ছিল না। স্কটের রিবেকায় হিন্দু রমণীর স্বার্থত্যাগ ও অন্যান্য আদর্শ হিন্দু রমণীর বিশিষ্টত্ব এবং হিন্দু বিধবা যে উচ্চতম কল্পনায় সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই সমাবেশ কবিকল্পনায় মুসলমান রাজকন্যায় নিদর্শিত হইয়াছে।

বড় লোকের ও ভাল লোকের জীবনের উপকারিতা।

বড় লোক ও ভাল লোক বলিতে ধনী লোক বুঝায় না। জীবনের জটিল-সমস্যা-সমাধানে সাধারণ ব্যক্তি স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া যেরূপ নিজজীবনের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়, মহাজনেরা তাহা করেন না। জগতের ভাষার প্রাণদান, চরিত্র বা মূর্ত্তি বা দৃশ্য গঠন বা রচনা, বহুবিধ লোকের হৃদয় যাচ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের দিকে পরিচালন, জন্মভূমি, সমাজনীতি ও রাজনীতির প্রতি অনুরাগ এবং প্রাণপণ আত্মবিসর্জ্জন এবং নবনবোন্মেষিনী বুদ্ধির বিকাশে নূতন নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা যে নিজ স্বার্থে বলিদান দিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাদিগের আদর্শ চরিত্র বা বিদ্যা বা বুদ্ধি বা পৌরুষের প্রভাবে কেবল যে নানা-বিষয়িনী বিদ্যা, ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশের উপকার সাধিত হইয়াছে এরূপ নহে, এই মহাপুরুষগণ যে পথ প্রদর্শিত করিয়াছেন, আজ সেই পথের পথিক হইয়া, অপরে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন এবং কাহার কাহার হৃদয়ক্ষেত্রে গুণবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এই মহাজনগণের চরিত্রের যদি বিশিষ্টত্ব না থাকিত তাহা হইলে অনেকেই তাহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের অবলম্বন করিত না, অথবা তাঁহাদের ভাষায় নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে আগ্রহান্বিত হইত না, অথবা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রাজনীতি বা সমাজনীতি অনেকের প্রিয় হইত না, অথবা তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ অনেকের অনুকরণীয় হইত না অথবা তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিয়া অনেকেই সমৃদ্ধ হইবার চেষ্ট করিতেন না।

যখনই দেশে বা সমাজে অভাব ও প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় তখনই এক একটী সমস্যার সমাধানে অনেকেই চিন্তিত হয়েন। কিন্তু বড় লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিতে পারেন। যে দেশে সেই সময় মহাজনের আবির্ভাব হয় সেই দেশই ধন্য। মহাজনেরা ধর্ম্মকে নীতিকে, দেশকে, সমাজকে, কলাবিদ্যাকে, ভাষাকে, শিল্পকে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়কে উন্নত করিতে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা সেই পন্থা অবলম্বন করিলে সকলেই উন্নত হইতে পারিব, নচেৎ আমরা আত্মসংযমে অপারগ হইব, আত্মচিন্তা ও আত্মভাব পরিস্ফুট করিতে অক্ষম হইব, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইব।

কোন মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে মন সহসা তদীয় লোকোত্তর কীর্ত্তিকলাপে নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার অনুপম সদ্গুণাবলীর অনুকরণে স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া থাকে। কি বাষ্পযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে, কি বয়ন যন্ত্রের অভাব পূরণ করিতে, কি মৃৎশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে, কেবল যে এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ নহে, এক ব্যক্তি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পরবর্ত্তী ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়া উন্নতির নিকট অথবা শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। আমরা যাহা কিছু উত্তম পাঠ করি, যাহা কিছু উত্তম শিক্ষা করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি, যাহা কিছু পরিধান করি, এক কথায় যাহা কিছু ভোগ করিয়া চরিতার্থ বোধ করি, তাহা প্রথমেই এরূপ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সেগুলির উৎপাদন ও প্রস্তুতির মূলে বড় লোকের অধ্যবসায় ও কর্ম্মপরম্পরার ফলসমষ্টি সন্নিহিত আছে।

পরোপকারীর জীবনী পাঠে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, দয়া বা কারুণ্যে, এবং সহানুভূতি ও উপকার করিবার ইচ্ছায়, প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা পরোপকার সাধন করেন—প্রত্যুপকার পাইব এ ভাব

কখনই তাঁহাদের হৃদয়ের বলবতী বাসনা হইতে পারে না। আমরা আরও উপলব্ধি করিতে পারি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তাহাদের উপার্জ্জনের চেষ্টা কেবল উপকার করিবার সামর্থ্য লাভের হেতুমাত্র।

সেইরূপ ধর্ম্মবীরের জীবনী পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা স্বার্থত্যাগ ও প্রাণবিসর্জ্জন কেবল পাপী ও নাস্তিকগণের উদ্ধারের হেতুমাত্র।

যুদ্ধবীরগণের অলৌকিক সাহস, অবসন্ন স্তিমিত সৈনিকের প্রাণে নবীন তেজঃসঞ্চার, ও মৃত্যু-আলিঙ্গন, দর্শন ও শ্রবণ করিলে স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষার প্রবলবাসনা হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়।

এ জগতে যাহা কিছু মঙ্গলময় তাহারই সমাধানে মহৎ ও সাধু ব্যক্তিরা অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিলে আমাদের হৃদয় প্রশস্ত, অন্তঃকরণ উন্নত, বুদ্ধি কর্ম্মফলা এবং সামর্থ্য কার্য্যপ্রসূ হইবে। এবং তাহা হইলেই আমরা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইব।

কলিকাতা দর্শন।

বাল্যকালে যখন কয়েকবার কলিকাতায় আসিয়াছি তখন জানিতাম যে, সার্কাস ও অন্যান্য তামাসা দেখিতে হইলে কলিকাতায় আসিতে হয়। পরীক্ষা দিবার কালীন কলিকাতায় আসিয়া অনেক দেখিলাম এবং বুঝিলাম যে কলিকাতায় দেখিবার ও শিখিবার অনেক আছে। প্রথমতঃ এইটী মনে হয় যে নৈসর্গিক শক্তিতে যেমন ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় সেইরূপ মানবের স্বার্থ-প্রণোদিত-শক্তিতে এক একটী স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়।

ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন ইংরাজ চিকিৎসক দিল্লীর সম্রাটের নিকট হুগলি কাশিমবাজার ইত্যাদি স্থানে অবাধে বাণিজ্য করিবার সম্মতি লাভ করেন এবং পরে ইংরাজ বণিকদের বাঙ্গালার নবাবের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা গঙ্গার পূর্ব্বপারে সুতানুটি নামক স্থানে তাহাদের কুঠি উঠাইয়া আনিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। এই সুতার হাট ক্রমে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় পরিণত হইয়াছে। কে জানিত সেই ধীবর ও সূত্রব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র পল্লী এককালে সৌধমালায় শোভান্বিত হইয়া প্রাসাদনগরী (city of palaces) বলিয়া অভিহিত হইবে? কে জানিত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইয়া এই ক্ষুদ্র তরণীসমাকুল সুতানুটী ঘাট অর্ণবপোত পূর্ণ প্রাচ্যদেশের একটী প্রধান বন্দর হইবে।

পল্লী হইতে এই রাজধানীতে আসিয়া সমস্তই নূতন বোধ হয়। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রাস্তায়ই গতিশীল শকটের ঘর্ঘর ও ব্যস্ত সমস্ত ব্যক্তির পাদবিক্ষেপ ও কোলাহলে পূর্ণ। এস্থানে বড় লোকেরা, মধ্যবিত্তেরা ও দরিদ্রেরা সকলেই কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং সকলেরই সময়ের মূল্য অধিক। এই কারণে এখানকার লোক সামান্য পথও ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। এখানে বাজন ও যানপরিচালন-কার্য্যে বিদ্যুৎ মনুষ্যের কিঙ্করত্ব করিতেছে। এখানে বর্দ্ধমান জনসংখ্যার পৌরুষ প্রকাশে প্রকৃতিদেবী ব্রীড়া-অবনত বালিকার মত আপন নগ্ন সুষমা প্রকাশ করিতে অবগুণ্ঠনবতী। এখানে স্বাধীন পক্ষীর গান নাই, বায়সের কিচিমিচি আছে, এখানে কৃত্তিবাসের মধুর সঙ্গীত নাই, হুজুগের ছড়া আছে, এখানে সরলতার পরিবর্ত্তে চতুরতাই অধিক দৃষ্ট হয় এবং মতলব না থাকিলে সহজে কেহ কথা কহে না।

কলিকাতার কোন বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম কি কি স্থান দর্শন করা উচিত তাহার উত্তরে বুঝিলাম যে তিনি যে স্থানে কর্ম্ম করেন সেইস্থান ও যাদুঘব কালিঘাট ও আলিপুরের চিড়িয়াখানা, নাচঘর গড়ের মাঠ, কেল্লা, গঙ্গাতীর ইত্যাদি অতি অল্প সংখ্যক স্থানের বিষয় তিনি অবগত আছেন। পবে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কলিকাতা কোন্ কারণে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তখন বুঝিলাম কলিকাতা বাণিজ্য ও আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের স্থান বলিয়া বিশিষ্ট হইয়াছে। এ কাবণে এইদিক দিয়া কলিকাতা দেখিবার চেষ্টা কবিলাম।

প্রথমে কলেজ স্কোযার গিযা বিশ্ববিদ্যালয় ও চতুস্পার্শ্বস্থ কলেজ সমুদায় দেখিলাম। পরে মনে হইল যাঁহাদের উদ্যমে শিক্ষাবিস্তারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভব হইযাছে তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মবণার্থে যে চিহ্ন আছে তাহাই দেখিব। গোলদীঘিব দক্ষিণ দিকে সামান্য প্রকাবে রক্ষিত ডেভিড হেয়ারের কবব দেখিলাম। যে মহাপুরুষের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার বিস্তাব সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহার স্মৃতি বক্ষাথে বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় কলিকাতাবাসীব সমধিক চেষ্টা নাই বুঝিতে পারিলাম। পরে গোলদীঘির পশ্চিম ধারে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সুলভে শিক্ষাবিস্তারের বন্দোবস্তের পথপ্রদর্শিত না হইলে আজ এত অধিক বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সম্ভাবনা হইত না সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়েরও এত শ্রীবৃদ্ধি হইত না। একারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে এই প্রস্তব মূর্ত্তি দেখিযা সন্তুষ্ট হইলাম। ইস্কুলের সংখ্যার আধিক্য দেখিযা প্রথমে মনে হইল বুঝিবা দয়ার সাগরেব অনুকরণে অনেক মহাত্মা অনুপ্রাণিত হইয়া সুলভে বিদ্যাদানের আগার স্থাপন করিয়াছেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে বিদ্যাসাগব মহাশয়ের দানে তাঁহার ইস্কুল কলেজ প্রতিপালিত এবং অন্যান্য ইস্কুল কলেজের দানে সেগুলির

স্বত্বাধিকারীর প্রতিপালিত। কি বিসদৃশ ব্যাপার! সৎকর্ম্মের ভাণ এবং সাধু আদর্শের অপপ্রয়োগ। পরে মেডিকেল কলেজ দেখিলাম ও সুলভে চিকিৎসক প্রাপ্তির মূল কারণ বুঝিলাম এবং একের অর্থে যাহা সম্ভবপর নহে তাহা বহুলোকের অর্থে নির্ম্মিত ও পরিচালিত হইয়া চিকিৎসা বিধানের উপায়, দানধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিচয়, হাসপাতাল হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম।

এইবার এই দেশের ভূতত্ত্ব অতীত ও বর্ত্তমান শিল্প, ধাতুজ সামগ্রী, জীবজন্তুর কঙ্কাল, অবিকৃত ভাবে রক্ষিত পশু পক্ষীর মৃত দেহ, প্রাচীন ভাস্করকার্য্য ও স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ দেব প্রতিমা ও ঘটনাচিত্র এবং খোদিত পুরাতন অক্ষরে রক্ষিত নানা যুগের অনুশাসন দেখিতে যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম দেশ দেশান্তরের লোক দেখিতে আসিয়াছে। প্রায় সকলেই এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখিয়া চলিয়া গেল। এক একটী ঘরে দুই একজন বহুক্ষণ ধরিয়া সামান্য এক একটী বস্তু অতিশয় আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে মনে হইল যাদুঘরের তাবৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক জগতে বিরল। এক এক বিষয় লইয়া এক এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিলে কৃতবিদ্য হইতে পারেন।

প্রাচ্য পুরাতত্ত্বের পরিষদগৃহ পুরাণ যাদুঘর দেখিবার বড়ই সাধ হইল। ভাবিলাম এখানেও বুঝি দেখিবার কিছু আছে। পরে শুনিলাম পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচ্য দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শাস্ত্র ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এখানে ভারতবর্ষীয় নানাভাষায় লিখিত হস্তলিপি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা দেখিলেই বা কি হইবে? যদি কখন পাঠ করিতে পারা যায় ত জীবন সার্থক হইবে।

পরে জীবতত্ত্বের জীবন্তশিক্ষার স্থান জুলজিক্যাল গার্ডেন বা পশুশালা দেখিতে গেলাম। তথায় জলচর ও সরীসৃপও রহিয়াছে দেখিলাম। মনে হইল জীবতত্ত্বের সামান্য একখানি পুস্তকে পশুজাতি কয় ভাগে বিভক্ত তাহাও যদি পড়িয়া আসিতাম তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া সুখী হইতাম।

শুনিলাম পশুশালার অনতি দূরে হাওয়া কুঠি (observatory) আছে। কিন্তু তাপমান যন্ত্র ও বায়ুমান যন্ত্রের কিছুমাত্র জানিয়া তথায় যাওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলাম না।

এইবার উদ্ভিদ্ তত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতার অপর পারে যে বোটানিকাল গার্ডেন আছে মেডিকেল কলেজের একটী ছাত্রের সহিত তাহা দেখিতে গেলাম। প্রতিবৃক্ষেই তাহার লাটিন নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম। যাহা হউক এই উদ্যানের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে কতক সমর্থ হইলাম। এখান হইতে স্থপতি বিদ্যার আগার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ দেখিতে গেলাম। তথাকার হাতেকলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

এইবার আমাদের দেশবাসীর যত্নে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার আগার দেখিতে গেলাম। মনে মনে কতই আনন্দ হইল, কতবার ভাবিলাম আরও অনেক বিষয় করে এইখানে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং কতকালে আরও অধিক বালক এখানে ভর্ত্তি হইয়া আপনাদিগের জীবনের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবে।

এইবার সদাগরী আফিসের একটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে বাণিজ্যের নিমিত্ত কলিকাতা এরূপ সমৃদ্ধ তাহার আমি কিছু দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন দেখিবার কিছুই নাই। বড় মুদিখানার মুহুরি যেরূপ খাতা লিখিয়া মাসে কিছু পায় ও ব্যবসার কিছুই অবগত নহে, তিনিও সেইরূপ বড় আফিসে খাতা লিখিয়া আইসেন ও

ব্যবসার কিছুই জানেন না। যাহা হউক বড়বাজারে যাইলাম ও দেখিলাম মাড়োয়ার দেশের লোকেই ব্যবসা করিতেছে। সেখান হইতে আলুগুদামে যাইলাম ও ভারী ভারী সদাগরী আফিস দেখিয়া বুঝিলাম বাণিজ্য না থাকিলে এ সকল কুঠির কোনই আবশ্যকতা নাই। ক্রমে রয়েল এক্সচেঞ্জের সম্মুখে যাইলাম ও শুনিলাম উপরে বণিক সমিতির সভাগৃহ। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের নিকট যে উত্তর পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম যে, এক এক আফিসের এক এক বিভাগের কিছু কিছু তাহারা অবগত আছেন এবং মোটের উপর কিছুই জানেন না। দালালপটীতে গেলাম, সকলেই দেখি কাণে কাণে কথা কহিতেছে ও ছুটাছুটি করিতেছে। তাহারা কেবল কোম্পানীর কাগজের অথবা অন্যান্য সামগ্রীর দর অবগত আছেন এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার অনুসন্ধানে শশব্যস্ত। বড় বড় সদাগরি আফিসের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়েও দেখিলাম আমার দেশবাসী নিযুক্ত রহিয়াছে কিন্তু কোন জিনিষের নির্ম্মাতা কোথায় থাকেন, তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না। পরে বান হউসে (Bonded ware house) দেখিতে গেলাম এবং শুনিলাম আমদানী মালের শুল্ক না দিতে পারিলে তথায় মাল রাখিতে দেওয়া হয়, কিন্তু এই জাতীয় গুদামের আবশ্যকতা কি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিল না। সংবাদপত্রে কোন্ ব্যাঙ্কে কত সুদ দেয় পড়িয়া থাকি, সেই জন্য ব্যাঙ্ক দেখিতে গেলাম। মনে হইল বুঝি এগুলি কল্পতরু বা টাকার গাছ, কারণ ১০০৲ টাকা দিলে বৎসরের শেষে ১০৪৲ টাকা পাওয়া যায়। কিরূপে যে তাহারা দেয় তাহাও কেহ বলিয়া দিল না। পরে গঙ্গার ধারে অসংখ্য অর্ণবপোত দেখিয়া বুঝিলাম যে, এইগুলি যে কেবল পণ্যসম্ভার লইয়া আগমন করে এরূপ হইতেই পারে না, এগুলি পণ্যসম্ভার লইয়া যাত্রাও

করে। এবং খিদিরপুর ডকে গিয়া দেখি দিবসে ও রাত্রে বিদ্যুতের আলোকে এক একখানি বৃহৎ অর্ণবপোত মালপত্র খালাশ করিতেছে অথবা উদরসাৎ করিতেছে। ফলকথা, ব্যবসার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেকার মেটকাফ হল আজি কালি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে। এই পাঠাগারে নানাভাষার পুস্তক আছে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তকের সংখ্যাই অধিক। এইখানে গিয়া বিনা খরচে পুস্তক পাঠ করিয়া আসা যাইতে পারে। তথাপি কি পুস্তক গিয়া পাঠ করিব ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির না করিয়া তথায় কেবল বেড়াইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এখানকার পাঠগৃহের কর্ম্মচারী ব্যতীত কাহার সহিত কথা কহিবার বা গোলমাল করিবার নিয়ম নাই।

কলিকাতার রাস্তাঘাট অতি পরিপাটী। বিশেষতঃ যে স্থলে সাহেবেরা বাস করেন ও উহার সন্নিকট গড়ের মাঠ ও কেল্লা, ইডেন গার্ডেন এবং ইংরাজটোলার নয়নাভিরাম ঋদ্ধাপণশ্রেণী, কি দিবসে, কি রাত্রের বৈদ্যুতিক আলোকে দেখিতে বড়ই সুন্দর। দূর নদীবক্ষ হইতে হাইকোর্টের উচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। লালদীঘির এক দিকে ছোটলাটের আফিস, অপর দিকে গম্বুজসহ পোষ্টাফিস এবং অন্যান্য দিকের আপণশ্রেণী ও কুঠি সমূহের আলেখ্য রাত্রিতে রথ্যাবলীর আলোকপ্রাচুর্য্যে যখন দীঘির স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তখন দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইতে হয়।

UNIVERSITY QUESTIONS

ENTRANCE EXAMINATION

1886. The habit of obedience and it's effect in the formation of character (see p 26)

1887. The evils of intemperance and the means of their remedy. (see p 13)

1888. The advantages of studying English for an inhabitant of British India

1889 The advantages of sound health and the means for its preservation (see p 13)

1890 Choose your companions most carefully, for a man is known by the company he keeps. (see p 23)

1891 The advantages of cultivating good and avoiding evil company (see p 23)

1892 The evil consequence of excessive avarice (see p 94)

1893 Honesty is the best policy (see p 61

1894 Virtue alone is happiness below (see p 61)

1895 The highest of virtue is to do good to others (see p 38

1896 The advantages of associating with the virtuous and the clever and the disadvantages of associating with unprincipled and illiterate people (see p 23)

1897 The advantages of acquiring a habit of depending upon one's own self (see p 29)

1898 Patience and perseverance can overcome all difficulties, or, where there is a will there is a way (see p 48, 52)

1899. Industry and frugality are the only way to wealth. (see p 75)

1900 Do your duty come what may (see p 77

1901 Hard and honest work is the only means of winning honour and distinction in life (see p 75)

1902 The advantages of forming habits of self-reliance from our earliest years (see p 29)

1903 Industry and perseverance overcome all difficulties (see p 48, 52)

1904 A vicious life can never be a happy life.

1905 Courage to do one's duty (see p 77)

1906 The way to wealth is broad It consists of two words, 'Industry and Frugality ,' that is, never spend your time and money in vain (see p 75)

1907. The respective duties of teacher and pupil

1908 Industry brings its own reward The last summer vacation and the use you made of it

1909 The value of a great and good life (see p 174) The natural scenerary of Bengal The story of Nala and Damayanti (see p 160) A business training is necessary for a business career (see p 103)

(1909 Supplementary E. E)—The story of Raja Harish chandra, (see p 132)

The Importance of Physical culture. A visit to any of the Great cities of India (see p 176)

FIRST EXAMINATION IN ARTS 1907.

(Optional paper)

Paper set by Babu Dinesh chandra Sen B A

Write an essay on any two of the following subjects

(*a*) The seasons of India their duration their bearing on domestic life, trade, and prices of articles—games and festivities of the seasons—their crops, fruits and flowers-deseases peculiar to each season and rules of health to be observed to avoid them (see p 122)

(*b*) The Bengali author you like best—reasons for your preference—his life—his principal works and their contents—his position in literature as compared with that of his contemporaries—his influence on the literature of his country

(*c*) Your own native village—its situation and surroundings—sanitation, water-supply and drainage, means of communication—educational institutions—its past history—any object of antiquarian interest that it may posses—its inhabitants—their education—their religion, customs amusements—any industry or produce which the place may be noted—suggestions for improving its condition

(*d*) Strength of character—how it helps to attain success in life—a man of ordinary talents with character compared with a man of genius without it—character more potent than wealth—its attendant virtue—perseverence, moral courage and self help—the relation of character to spirituality—examples in illustration. (see বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ)

(*e*) The study of history—its influence on the progress of individuals and nations. Discuss the remark usually made that the Hindu mind is averse to the study of history (see বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ)

FIRST EXAMINATION IN ARTS, 1908.

BENGALI COMPOSITION

(*Optional paper*)

Paper set by Babu Dinesh chandra Sen B.A.

Write essays on any two of the following subjects —

(*a*) City-life and country-life .—experiences of both essential for intellectual and moral development—their respective advantages and disadvantages— how to avoid the latter—causes that have led to the growing tendency in Bengal for desertion of country-life in perference to city-life—effects of such a perference on our society generally. (sea বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ) 50

(*b*) Any long journey that you may have made — course and mode of journey—the objects that struck you most during the journey— anything of historical interest that you came across—condition of weather and their bearing upon your health—hardships endured—your companions—any amusements in which you took part 50

(*c*) The character of Kundanandini in Bishabriksha-how far this creation of Bankim's fancy is an outcome of European influence, and how far it represents the ideal ef womanhood in Bengal—Kundanandini compared with Ayesha in Durgeshnandini—the influence of these two characters on society (see p 170) 50

(*d*) Earthquakes —their causes—some of the earth quakes that have occured in Bengal in past years—the greatest earthquake of which you have read in history (see p 147) 50

(*e*) Honesty is the best policy —examples of honest men thriving in the long run and of the ultimate failures of dishonest men in spite of their early successes in life from history and from your own observation. (see p 61) 50 (*f*) The domestic animals of Bengal—the help they render to householders—their food—precautions to be taken to protect them from death and disease—the training necessary to make them useful—remarkable instances of their fidelity and usefulness (see p 115) 50

INTERMEDIATE EXAMINATION 1909

Paper set by Babu Dinesh Chandra Sen B A

Write an essay on either of the following subjects —

(*a*) Description of your village—its situation, topography, natural features, history, if any, old buildings, temples, shrines, &c, population, race, religion, division into castes, agricultural products, principal crops, nature of soil, agricultural methods, methods of irrigation, relation between landlord and tenant, trades and industries, village-marts, fairs, communication—roads, sanitation supply of drinking water, conditions of drainage, prevalent diseases, epidemics, medical assistance, village festivals, education methods of settling disputes, general needs of the people 40

(*b*) Duty of students —conduct at home, conduct at school, regularity in habits, regularity and punctuality in attendance, behaviour in the class-room, conduct towards teachers, towards class-mates, virtue of obedience, submission to discipline, common instances of dishonourable conduct in students, common temptations, diligence in study, rivalry and emulation; academic success, ideal of student-life (see p 17) 40